মজারু মামা

মজারুমামা

আশাপূর্ণা দেবী

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥
॥ জানকী বুক ডিপো । কলকাতা ॥

॥ প্রকাশ জুন, ১৯৬৩

"শ্রীনাথ নিবাস", কোন্নগর ঠিকানা থেকে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। ২৭৷৩-বি হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ঠিকানার শক্তি প্রেসের পক্ষ থেকে অজিতকুমার বসু কর্তৃক মুদ্রিত।

আনন্দরূপ—

শ্রীমান নীলোৎপল সরস্বতী

আদরণীয়েষু

মজারুমামা

"ধেত্তারি, ভাল লাগছে না।" ফোটন বেজার গলায় বলে উঠল, "আজ আর আসছে না মজারুমামা। ক্যারমবোর্ডটা সাজা বরং। পেটা যাক। তা-ই যাক। কী আর করা।"

ছোটন বোর্ডটা পেতে ঘুঁটি সাজিয়েছে, ফোটন স্ট্রাইকারটাকে মাথায় ঘষে নিয়ে বোর্ড ফাটাবার জন্যে তাক করছে ব্যস। ফস করে আলোটা নিভে গেল! ঝুপ করে ঘরের মধ্যে নেমে এল গাঢ় অন্ধকার! আর এমনই আশ্চয্যি, ঠিক সেই মোমেন্টেই ঘটল এই অলৌকিক ঘটনাটি! একদম ঝপ করে। দরজায় মজারুমামা!

যে মজারুমামার জন্যে ফোটন ছোটন রিঙ্কি পিঙ্কি সেই কখন থেকে ছটফট করছে। রিঙ্কি তো তখন থেকেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায় চোখ ফেলে। পিঙ্কি একবার করে ছুটে যাচ্ছে আর আবার ঘরে ফিরে এসে হাত-পা ছুঁড়ছে, "আরে বাবা রে বাবা! কী হল মজারুমামার? আসছে না কেন?"

তা এরাও তো সেই কথাই বলে চলেছে মিনিটে মিনিটে, ফোটন আর ছোটন। সত্যি, কী হল মজারুমামার? এত দেরি করছে কেন?

"নাঃ, হোপলেস! কী যেন একখানা মজারুমামাটা!"

"আচ্ছা হল কী বল তো? কী হতে পারে?"

হতে কত কীই পারে অবশ্য! আবার কিছু না হতেও পারে।

"ইশ! কী যে বিচ্ছিরি লাগছে! ছোটমাসি পষ্ট করে বলে গেল বিকেলে, 'মজারুদা আসছে। আমি বাড়ি নেই বলে যেন কেটে পড়ে না, তোরা একটু জমিয়ে নিয়ে বসিয়ে রাখবি!'"

"হুঁ! বিকেল! বিকেল আবার কালকে হবে।"

"মজারুমামাটা এই রকমই। মনে নেই সেবার পিকনিকে যাবার দিন? লাস্ট মোমেন্টে আসতে পারবে না খবর দিয়ে সব গুবলেট করে দিল। ভীষণ অদ্ভুত!"

"এই এ রকম বলিস না! তেমনি আবার পিঙ্কির জন্মদিনে কউ নেমন্তন্ন না করতেই নিজে থেকে এসে কী মজাটাই না করে

গেল ভাব !"

"তা সত্যি রে। সেই কোথা থেকে যেন ছো-নাচের এক রাক্ষুসে মুখোশ নিয়ে এসে পরে, সবাইকে ভয় পাইয়ে—হি হি হি ! নেমন্তন্ন না করার জন্যে রাগটাগ নেই।"

"হুঁ রে, মনে পড়েছে। বলেছিল 'পিঙ্কির জন্মদিন আর মনে রাখব না ? কী দিনে জন্মেছিল তা বল ? স্বয়ং কেষ্টঠাকুরের জন্মদিনে।' মা বলল, 'তোকে কে নেমন্তন্ন করবে বাবা। কখন যে কোথায় থাকিস তা তুইই জানিস ! আর কেষ্টঠাকুরই জানে।'"

ফোটন আর ছোটনের এই ক্ষোভ দুঃখ অস্থিরতা আর স্মৃতি-চারণের মাঝখানে মাঝখানে রিঙ্কি ছুটে ছুটে এসে বলে যাচ্ছে, "ও রে বাবা রে, এত দেরি করছে কেন রে মজারুমামা ! আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে ! এই দাদা, রাস্তায় গিয়ে দেখ না !"

"রাস্তায় গিয়ে ?"

ফোটন বলেছে, "তুই তো বারান্দা থেকে ঝুঁকে গলাটাকে প্রায় রাস্তায় ঠেকিয়েই দাঁড়িয়ে আছিস ! আর কী দেখব ?"

পিঙ্কি ডুকরে উঠছে মাঝে-মাঝে, "ছোটমাসি যে কেন বলল, মজারুমামা আসবে ! এত দেরি হয়ে গেল, আর এসেছে। ধেত্তারিকা !"

তা সত্যি, এদের এই আশাভঙ্গটি বড়ই দুঃখজনক !

মজারুমামা মানেই তো ভয়ংকর ভয়ংকর উৎকট উৎকট সব মজা !···মজারুমামা মানেই জমজমাটি মজলিশ, মিনিটে মিনিটে হাসির হুল্লোড়।···মজারুমামা মানেই গায়ে-কাঁটা-দেওয়া ভৌতিক, আধাভৌতিক, দৈবিক, দুঃসাহসিক, অদ্ভুতুড়ে সব নতুন নতুন গপ্প !···তা ছাড়া কখন কোন স্টাইলে যে হঠাৎ হঠাৎ একখানি মজা প্রেজেণ্ট করবে মজারুমামা তা বোধহয় মজারুমামারও অজানা !

ছোটকা তো বলে, 'তোদের মজারুমামার কাছাকাছি এলে, পকেটে একটা ছুঁচ সুতো মজুত রাখা উচিত। কে জানে বাবা

কখন না হাসতে-হাসতে পেটটা ফেটে যায়।"

মনোজ'কে 'মজারু' করে ফেলা ওই ছোট্কারই অবদান।

কিন্তু কতদিন, যে আসেনি মজারুমামা!

আজ যখন বেরোবার সময় ছোটমাসিরা বলল, "এই, আজ বিকেলে মজারুদা আসবে, তোরা একটু বসিয়ে রাখিস, যেন পালায় না" শুনে তখন এরা মানে ফোটন ছোটন রিঙ্কি পিঙ্কি আহ্লাদে প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল।

"অ্যাঁ। মজারুমামা?"

"সত্যি?"

"ঠিক?"

"একদম ঠিক। ওখানে থাকতে চিঠিতে জানিয়ে রেখেছে আমায়! উঃ, কতদিন দেখা হয়নি!"

রিঙ্কি অবশ্য একবার বলে ফেলেছিল "তো তোমার সঙ্গেই দেখা করতে আসছে মজারুমামা তুমি চলে যাচ্ছ? একদিন না হয় সিনেমাটা বাদ দিতে ছোটমাসি!"

শুনে দুঃখে ভেঙে পড়েছিল ছোটমাসি। বলেছিল, "সিনেমাটা বাদ। কোন প্রাণে বলতে পারলি রে একথা? দশদিনের তো মেয়াদ, তার চার চারটে দিন কেটেই গেল। একদিনই মাত্র দুটো হল-এ সিনেমা দেখেছি, আর ক'দিন তো মাত্র একটা করে। তবেই বল্ আর কটাই বা দেখে উঠতে পারব। কোথায় পড়ে থাকি জানিস? বাংলা সিনেমার মুখ দেখতে পাই? এসেই তো পড়ব বাবা। রাত্তিরে তো থাবে এখানে মজারুদা, তখন আড্ডা হবে।"

চলে গিয়েছিল ছোটমাসি ফোটন কোম্পানির মাকে কব্জা করে নিয়ে। দুটো হল-এ টিকিট কাটা আছে। তিনটে ছটা, ছটা নটা!

ছোটমাসি চলে যাবার পর ছোটন অবশ্য রিঙ্কিকে বকেছিল, "বোকার মতো ওকথা বলতে গেলি কেন রে? বড়রা না থাকলেই তো আমাদের লাভ। মজারুমামাকে বেশি করে পেয়ে যাব।

ওনারা এলে, আর আমরা পাত্তা পাব ?"

রিঙ্কি স্বীকার করেছিল, সত্যিই তার ভুল হয়েছিল। আর তারপর থেকেই 'লাভের' আশায় ছটফটাচ্ছে একগণ্ডা ভাইবোন। মিনিট গুনছে, আর মিনিটে মিনিটে বলছে, 'দূর ছাই, কী যে করছে মজারুমামা।··· বিকেল ছেড়ে সন্ধে পার হয়ে গেল !'

"নাঃ। নো হোপ। আজ আর চান্স নেই !"

"আমাদের কপালটাই খারাপ !"

শেষমেশ রাগে দুঃখে ঘোষণা : "ধেত্তেরি, ভাল্লাগছে না, ক্যারমটা পাড়া হোক। পেটা যাক !"

সেই ক্যারমে ঘুঁটিগুলি সাজানো হয়েছে মাত্তর, সঙ্গে সঙ্গে লোডশেডিং। আর সেই মুহূর্তে ঘরের দরজায় মজারুমামার আবির্ভাব !

একসঙ্গে চারটে গলা চেঁচিয়ে উঠল, "উঃ মজারুমামা ? এতক্ষণে আসা হল ? এই তোমার বিকেল ?···ছোটমাসিরা সিনেমা গেছে, ভাবছিলাম আমরা একা একা তোমার গল্প শুনব।··· ইশ্ ! তুমি এলে, আর এক্ষুনি আলোটা নিভে গেল।···এত দেরি করলে কেন ?"

এতগুলো প্রশ্ন আর অভিযোগের উত্তরে একটি মাত্রই শব্দ উঠল, নাকি-নাকি সুরে "হাঁউ মাউ খাঁউ ! মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ !"

কিন্তু ভয় পেতে বয়ে গেছে এদের। ছোট দুটোরও নয়। পিঙ্কিসুদ্ধু বলে ওঠে, "ও মজারুমামা, আমরা বুঝি এখনও আগের মতন ছোট আছি যে হাঁউমাউখাঁউ শুনে ভয় পাব ? সেবারের মতো মুখোশ পরে এলেও এখন আর ভয় পাব না। এই ছোড়দা, একটা টর্চ জ্বাল না।"

ছোটন বলল, "টর্চ তো মা'র ঘরে। কে যাবে বাবা ? মজারুমামা, তোমার লাইটারটা জ্বালো না একটু।"

আবার নাকিসুর, "আমার বঁয়ে গেছে।"

"মজারুমামা, যতই তুমি নাকি সুর করো, আমরা ভয় পাচ্ছি না। জ্বালো না বাবা লাইটারটা। ও মজারুমামা, অন্ধকারে বিচ্ছিরি লাগছে ; তোমায় দেখতে পাচ্ছি না।"

হঠাৎ নাকি সুরের বদলে 'পাকি' গলা "কী ফ্যাচফ্যাচ করছিস, অ্যাঁ! মজারুমামা আবার কী? মজারুমামা! সাতজন্মে এমন কিম্ভুত নাম শুনিনি। কস্মিনকালেও তোদের ওইসব মজারু-শজারুকে চিনি না আমি।"

কিন্তু রিঙ্কি হল গিয়ে দুর্দান্ত মেয়ে, সে ওসব ধমক-টমকে ঘাবড়ায় না। সে হেসে ওঠে, "হি হি হি মজারু শজারু। সাতজন্মেও শোনোনি এমন নাম। তবে তোমার নাম কী শুনি?"

"আমার নামে তোদের কী কাজ, অ্যাঁ?"

"আহা! তোমায় তবে কী বলে ডাকব শুনি?"

ছায়ামূর্তি বলে, "আমায় ডাকবারই বা কী দরকার? অ্যাঁ!"

"বা রে, না ডাকলে কী করে গল্প করব মজারুমামা?"

"খবরদার, ওই সব মজারু-গজারু বলবি না, আমার নাম হচ্ছে, গোকুল গড়াই।"

"কী? কী নাম তোমার? হি হি হি! আবার বলো না।"

"বললুম তো! আমার নাম হচ্ছে গোকুল গড়াই। তবে পাড়ার লোক আড়ালে বলে চোর-গোকলো। বলুক গে। আড়ালে লোকে কী না বলে।"

"চোর গোকলো! হি হি হি! ছোড়দা রে এবারে মজারুমামার কী মার্ভেলাস স্টাণ্ট। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, একবার নাকি তুমি 'বকরাক্ষস' হয়েছিলে মজারুমামা? মা বলে না ছোড়দা? যতই খাবার দেন সব সাবাড়। আর একবার হয়ো না মজারুমামা। আমি বেশ দেখব।"

"বটে! মজারুমামা বলে, "বকরাক্ষস দেখার সাধ? তা দেখিস। সব সাবড়ে দেব! এখন সর, আমায় আমার কাজ করতে দে!"

"কাজ! তোমার আবার কাজ কী মজারুমামা?"

"এই মেয়েটা তো আচ্ছা ফ্যাচফ্যাচানি। চোরের আবার কী কাজ চুরি করা ছাড়া?"

ছোটন হেসে বলে ওঠে, "তা আলোটা জ্বলুক মজারুমামা। অন্ধকারে তো কিছু দেখতেই পাবে না। কোথাও একটা দেশলাইও

খুঁজে পাচ্ছি না। মা না এমন। দেশলাই মোমবাতি টেবিলে রেখে দেবে তো? আমরা কজন ছোট একা রয়েছি।"

"হ্যাঁ, তাই তো!"

পিঙ্কি পিনপিনিয়ে বলে, "নিজেরা বেশ মজা করে রোজ-রোজ সিনেমা দেখতে যাওয়া হবে, আর আমরা একা পড়ে থাকব। আবার লোডশেডিং পাজিটাও এসে হাজির হবে। ও মজারু-মামা, একবারটি তোমার লাইটারটাই জালো না গো। তোমায় দেখি!"

"লাইটার-ফাইটার নেই আমার।"

এবারে ফোটন হেসে ওঠে, "তুমি আছ আর তোমার লাইটার নেই, এ হয় মজারুমামা?....তা, তোমায় দরজা খুলে দিল কে?"

হেঁড়ে গলায় মজারুর উত্তর, "আমায় আবার দরজা খুলে দিতে লাগে নাকি? জন্মে কক্ষনো কেউ আমায় দরজা খুলে দেয়নি, দেয় না দেবেও না। দরকারটা কী? ছাতের রেনওয়াটার পাইপগুলো তবে আছে কী করতে?"

"হো-হো-হো, হা-হা-হা, এমন মজার কথা বলো তুমি। আর কতরকম যে গলা করতে পারো। দূর ছাই; লোডশেডিংটা আর সময় পেল না। সেই কখন থেকে হাঁ করে বসে আছি তুমি আসবে-আসবে করে। মিনিট গুনছি। কেবল-কেবল রাস্তা দেখছি। আর তুমি...."

"আহা রে, আজ আমার কী ভাগ্য! সাতজন্মে কেউ কখনো আমার আশায় পথ চেয়ে বসে থাকে না রে। তুই একটু জল খাওয়াতে পারিস?"

এখন গলার স্বর একটু কম বিকট।

"জল? এ মা, শুধু জল? ফ্রিজে কত কী রয়েছে। এই বিচ্ছিরি অন্ধকারটা হয়েই তো যত জ্বালা। সুশীল! এই সুশীল!"

মজারু বলে ওঠে, "এই, চোপ, চেঁচাবি না। রাখ তোর সুশীল। আমি নিজেই নিচ্ছি। ওই তো দালানের কোণে তোদের সাধের ফ্রিজ!"

"তা তো তুমি জানোই! কিন্তু ভীষণ অন্ধকার যে

মজারুমামা !"

"নিকুচি করেছে তোদের অন্ধকারের! অন্ধকারেই আমার চোখে মানিক জ্বলে।"

দরজার কাছের ছায়াটা নড়ল। অতঃপর এক ঝাপটে ফস করে ছায়াটা সরে গেল।

ফোটন চেঁচিয়ে উঠল, "ও মজারুমামা, দাঁড়াও, একটা টর্চ পেয়েছি—"

"অ্যাই খবর্দার! টর্চ-ফর্চ জ্বালবি না।"

কিন্তু জ্বালবেই বা কী! এ তো সেই ব্যাটারিফুরনো টর্চটা। বাবা কাল ব'লেছিলেন, ফোটন, তোর বয়েসে আমি কত কাজ করেছি। আর তুই এইটুকুও পারিস না? বললাম না কাল, টর্চটায় একটু ব্যাটারি ভরে রাখ।

বলেছিলেন। যেমন সর্বদাই কত কী বলেন।

রাখেনি ফোটন। তাই জ্বলল না টর্চ। ওদিকে মজারুমামার বারণও। না জ্বলেছে একরকম ভালই। জ্বললে মজারুমামা রাগ করে চলেই যাবে কি না কে জানে।

রিঙ্কি দরজা থেকে চেঁচায়, "ফ্রিজ খুলতে পেরেছ মজারু-মামা?"

"ফ্রিজ! হা-হা-হা। ফ্রিজ খুলতে পারব না? বলে গডরেজের লকার খুলে-খুলে হাত পাকা। খুলেছি, বেশ ভাল-ভাল সব খাবারদাবার সাঁটছি টপাটপ বকরাক্ষসের মতো।"

হি-হি-হি। রিঙ্কি হাসে, "মালাই চমচম তো? ভীম নাগের তস্য পৌত্রের জলভবা কড়াপাক?···ছোটমাসির তৈরি ডিমের পাটিসাপটা, আর মার তৈরি কাশ্মিরি গোকুলপিঠে? সবই বোধহয় তোমার জন্যেই ছিল মজারুমামা। তোমার যখন আসার কথা!···আহা অন্ধকারে খেতে পেরেছ কিছু?"

দালান থেকে হাসির আওয়াজ, "কিছু কী রে? এমন সব ভালমন্দ খাবার, কেউ 'কিছু' খেয়ে ছেড়ে দেয়? সব সাঁটছি। ···আঃ! তার সঙ্গে বোতলের এই ঠাণ্ডা জল! অমৃত! যাক, এবার আমায় আমার কাজ করতে দে!"

ছায়াটা আবার ঘরে ঢুকে এল।

"মজারুমামা, অত সরে-সরে যাচ্ছে কেন? ছুঁতে পারছি না, ধরতে পারছি না, কাছে এসো না!"

পিঙ্কি প্রায় কাঁদো-কাঁদো।

কিন্তু তার মজারুমামার 'মামাত্ব' কই?

সে তো প্রায় ধমকে ওঠে, "ধরবি?, ধরবি মানে কী? আজ পর্যন্ত কেউ আমায় ধরতে পেরেছে? তাই তুই ধরবি? সর। সবকটা এই দেয়াল সেঁটে দাঁড়িয়ে থাক। আমাকে একটু নিশ্চিন্দি হয়ে কাজ করতে দে। চটচট সারতে হবে, নাকি তোদের সঙ্গে বাকতালা করব?"

ফোটন এখন জোর গলায় বলে, "এবার তুমি বড্ড বেশী মজা করছ মজারুমামা! ভাল্লাগছে না! কী সব উলটো-পালটা কথা বলছ। জানি না বাবা। অন্ধকার দেখে খুব ঠকাতে ইচ্ছে করছে আমাদের, কেমন? কেবল বলা হচ্ছে কাজ করতে দে। কাজ অবার কী তোমার শুনি?"

"শুনবি? হে-হে-হে। কাজ হচ্ছে ঘর সাফ করা।"

রিঙ্কি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, "এ মা, তুমি আবার ঘর সাফ করবে কী? কেন, সুশীলদা কি, হি-হি-হি, বনবাসে গেছে?"

পিঙ্কি বলে ওঠে, "বিকেলে তো সাফ করেছে সুশীলদা ন্যাতা নিয়ে বালতি নিয়ে।"

"সুশীল? সুশীলের সাফ করার কথা বাদ দে।"

বিজ্ঞের মতো বলে ছোটন, "ছোটমাসি তো বলে তোদের সুশীলবাবু ঘর সাফ করে যায়, বোঝাও যায় না, করেছে কি করেনি। পায়ে খুব ধুলো-বালি কিচকিচ করছে বুঝি মজারুমামা?

"ফের মজারু-শজারু? বলেছি না ওই সব বিটকেল নামে ডাকবি না আমায়।"

"বেশ বাবা, ডাকব না। তো, বাবার হাওয়াই চটিটা এনে দেব তোমায়? অন্ধকারেও খুঁজে পেতে পারি। দরজার কাছেই আছে।"

"হাওয়াই চটি। ধ্যেত! দরকার নেই তোর বাবার চটিতে। তো, বাবা কোথায়?"

"বাবা তো অফিস থেকে বেরিয়ে সিনেমা হলে এসে জুটবে মা ছোটমাসিদের কাছে। দুটো সিনেমা দেখছে তো? তিনটে-ছটা, ছটা-ন'টা। তা, শেষেরটায় বাবাকে যেতে হবে। নইলে অত রাত্তিরে ছোটমাসিরা প্রাচী থেকে এই যাদবপুরে ফিরবে কী করে?"

"হেঁহেঁ হেঁ! ভালই তো। হেঁহেঁহেঁ!" অন্ধকারের মধ্যে নড়েচড়ে বেড়াতে-বেড়াতে মজারু কেমন এক বিটকেল গলায় হেসে ওঠে।

"মজারুমামা! তুমি এমন বিচ্ছিরি গলায় হাসছে কেন?"... ছোটন সন্দেহ-সন্দেহ গলায় বলে, "এবার বুঝি হরবোলা শিখে এসেছ।"

"কী? কী বললি? কী শিখে এসেছি?"

"হরবোলা গো, নাহলে এতরকম গলা করছ কী করে? কত রকমই যে গলা শুনছি। শুধু তোমার মতনটা বাদে। বুঝেছি, সেবারে বহুরূপী হতে শিখে এসেছিলে, এবার হরবোলা!"

"অ্যাই! কী বাজে-বাজে কথা বলছিস?"

"আহা রে! বাজে-বাজে বই কী!"

ছোটন বলে, "ছোটকার বিয়ের সময় এসে বহুরূপী হওনি তুমি? বাবাঃ! ইয়া মোটকা এক ল্যাজওয়ালা বীর হনুমান সেজে নতুন করে কনের ঘরের মধ্যে ধুপ করে লাফিয়ে পড়ে কী কাণ্ড, কী কাণ্ড! পিঙ্কিদের হয়তো মনে নেই।"

কিন্তু রিঙ্কি সতেজে বলে, "আমার খুব মনে আছে! নতুন কাকি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আঁআঁ করছে...বড়পিসি নতুন বউয়ের চেঁচানো শুনে বকতে এসে নিজেই হাঁক-পাঁক করতে করতে দে-ছুট। মনে নেই আবার! তোমার মনে পড়ছে না মজারুমামা?"

"হাঁ। বোধহয় পড়ছে।"

"এ মা! মনে পড়ার আবার বোধহয় কী? এমন উৎকট মজার কথা বলো তুমি! তো তোমার সেই বহুরূপী সাজবার সব ছালচামড়া গোঁফ-দাঁড়ি ল্যাজ-ফ্যাজ কিছু আনোনি তো?"

কী? ছালচামড়া, ল্যাজ-গোঁফ? ভাগ্।"

"আহা, ছোটমাসি বেশ দেখতে!"

এখন ছায়ামূর্তির গলা থেকে ঠিক ভোম্বলজ্যাঠার মতো গম্ভীর স্বর বেরোল, "এক জায়গায় একই খেলা দেখায় বোকারা, বুঝলি ?"

"বাঃ, ছোটমাসি তো দেখেনি।"

"তোদের ছোটমাসি আরও অনেক খেলা দেখবে।"

"বাবাঃ! মজারুমামা, তোমার গলাটা ঠিক ভোম্বলজ্যাঠার মতো লাগল। এবারে এই হরবোলাটাই শিখে এসেছ, তাই না? কী কী ডাক ডাকতে পারো? রিঙ্কির গলার আগ্রহ, উত্তেজনা। "মুর্গির ডাক ডাকতে পারো? ঘোড়ার ডাক? কুকুরের কান্না? রেলগাড়ির ইঞ্জিনের ডাক,? মিনিবাসের হর্নের ডাক? আমাদের স্কুলে প্রাইজের দিনে না, একজন হরবোলাবাবু এসে—মজারুমামা!"

হঠাৎ থেমে যায় রিঙ্কি। বলে ওঠে, "তুমি আলমারি খুলছ? কেন গো?"

"খুলছি ভাল করে সাফ করে বন্ধ করে দেব বলে। আহা এ বাড়ির গিন্নি কী গুড গার্ল।"

মজারুর গলার স্বর এখন ভোম্বলজ্যাঠার মতো নয়, বরং ছোট্কার মতো, মজা-মজা হাসি-হাসি। "আহা! জগতে যে চুরিটুরি বলে একটা কথা আছে জানেনই না, চোর বলে একটা জিনিস আছে তাও। না। বেশ বেশ!"

"হ্যাঁ, বেশ বই কী! দেখেছিস দাদা, ছোড়দা, মা'র নিজের বেলায় দোষ হয় না, যত দোষ নন্দ ঘোষ আমাদের বেলায়! আমরা যদি পেনটা কি স্কেলটা, কি মাইনের বইটা একটু এখানে-সেখানে ফেলে রাখি কী বকুনি! কী বকুনি!...ঠিক, আছে মজারুমামা, তোমায় আর বন্ধ করতে হবে না, যেমন ঝুলছে ঝুলুক। এসে নিজের কীর্তিটা দেখুন।"

"তা দেখুন।" মজারু কণ্ঠ বলে ওঠে, "তবে ভেতরটা সাফ করে ফেলি।"

"অন্ধকারে আবার তুমি কী সাফ করবে মজারুমামা! যা হাণ্ডুল-মাণ্ডুল হয়ে আছে। হবে না? বলে ছোটমাসির মার্কেটিং! যখন ইচ্ছে, আর যত ইচ্ছে শাড়ি কিনে আনছে, আর আলমারিতে

ঠুসছে। ছোটমাসিদের ওখানে নাকি বাংলা সিনেমাও নেই, বাংলা শাড়িও নেই। তাই কলকাতার সব শাড়িগুলো কিনে নিয়ে যাবার তাল। আচ্ছা, নিয়ে যাবে কী করে বল তো?"

"সেই তো!" মজারু বলে ওঠে, "সেটাই তো সমস্যা। ঢাউস একটা স্যুটকেস তো এনেছে মনে হচ্ছে, তা সেটাও তো বোঝাই! কিসে কী নিয়ে যাওয়া যাবে!"

"ওমা! ছোটমাসি যে একটা ঢাউস স্যুটকেস এনেছে, তুমি জানলে কী করে? সে তো ও-ঘরে।"

"কী করে জানলাম? হে-হে-হে, । জানিস না অন্ধকারে আমার চোখে মানিক জ্বলে, আর হাত না দেখেও আমি গুনে বলতে পারি। স্যুটকেসটা চাকা লাগানো তো? ভারী খাসা জিনিস। যত ভারীই হোক গড়গড়িয়ে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।"

"ঠিক, ঠিক। কী দারুণ। ও মজারুমামা, তা হলে হাত গুনে বলে দাও না গো আমার রেজাল্টটা কী হবে!"

"দূর বাবা! এ তো আচ্ছা মেয়ে! যেমন একজামিন দিয়েছিস, তেমনি রেজাল্ট হবে। আবার কী?"

" আঁ, আঁ, আঁ! ও ছোড়দা দ্যাখ না—"

রিঙ্কির গলা আকাশে ওঠে, "মজারুমামা আমায় রাগাচ্ছে। আমি বুঝি খারাপ পরীক্ষা দিয়েছি?"

"অন্ধকারে তীর-ছোঁড়াছুঁড়ি।"

"অ্যাই। চোপ্! আমি বলেছি খারাপ দিয়েছিস? বলেছি, যেমন দিয়েছিস! আমি বেটা চোর-গোকলো ওসব রেজাল্ট-ফেজাল্টের কী বুঝি?"

"চোর-গোকলো!" ফোটন বলে ওঠে, "ওঃ মার্ভেলাস! দারুণ একখানা নাম আবিষ্কার করেছ বটে মজারুমামা। মাথায় এলও তো!"

ফোটন এতক্ষণ বিশেষ কথা বলছিল না। কেবল অন্ধকারেই এখানে-সেখানে, তাকে, জানলার ধারে, বইয়ের শেলফে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল একটা দেশলাই আর মোমবাতির টুকরো-ফুকরো পায় কি না। কত সময়ই যে এরকম পড়ে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু দরকারের সময়? নেভার! এখন হতাশ গলায় বলল, "এই,

মজারুমামাকে এত জ্বালাতন করছিস কেন? ইচ্ছে হলে মজারু-মামা অন্ধকারেও গল্প বলতে পারে। তাই না মজারুমামা?"

"হুঁ! বলব। অপারেশানটা শেষ হোক। তাপর।"

"অপারেশন কী? অ্যাঁ! ও মামা। হঠাৎ অপারেশনের কথা কেন? কিসের অপারেশন? কার অপারেশন?"

"কেন, কিসের, কার?" সেটা পরে বুঝবি!"

"জানি না বাবা! ও সব বুঝতে-টুঝতে চাই না। আমরা তোমায় ধরছি রোসো।"

কলকলিয়ে ওঠে সবকটা। বলে, "এই শোন, মজারুমামা আলমারির কাছে, আয় সবাই মিলে ধরে ফেলি!"

"এই যে এটা কার হাত? ধ্যেত। এ তো ছোটনের। এই, এই যে পিঠ না তো! মজারুমামা তুমি শার্ট পরেছ না পাঞ্জাবি? এই যে... এই...যে ধরেছি!"

"অ্যাই! অ্যাই! ফোঁড়া! ফোঁড়া!"

"ফোঁ-ড়া!"

সব কটা হাত নিজের-নিজের দুপাশে ঝুলে পড়ল।

মজারু নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে বলে, "সর্বাঙ্গে ফোঁড়া। বুঝলে হে ভাগ্নে-ভাগ্নিরা! চেপে ধরলেই রক্ত-ফক্ত। দ্যাখো, কারুর হাতে-টাতে লেগে গেল কি না।"

ততক্ষণে চার-দুগুনে আটখানা পা পিছু হাঁটতে-হাঁটতে একেবারে ওদিকের দেয়ালে সেঁটে গেছে। আর দেখছে হাত ভিজে-ভিজে কিনা।

তবু কথা কয়ে উঠল ছোটন, "ওঃ, তাই তুমি অপারেশনের কথা বলছিলে?"

"হেঁহেঁ, ঠিক বুঝেছিস তো! যাক এবার তাহলে—"

এই সময় পিঙ্কি হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল, "আলো কি আজ আসবে না? মা কি আজ আসবে না?"

ফোটন বলে উঠল, "ধ্যেত, কাঁদছিস কেন?"

"আমার ভয় করছে। আমার কান্না পাচ্ছে! আমার মজারুমামাকে ভূত মনে হচ্ছে!"

"কী বললি? বাঃ। ঠিকই বলেছিস। এ ব্যাটা তো একটা

ভূতই ! গোভূত। হাম্বা-হাম্বা খাম্বা-খাম্বা, হাঁউ-মাউ-খাঁউ !"

"আঁ আঁ আঁ।" পিঙ্কি কেঁদে ওঠে।

অন্ধকার ভেদ করে আবার সেই বিকট গলা, "অ্যাই, চোপ ! এক চড়ে কান্নাকে বিন্দাবনে পাঠিয়ে দেব। মেয়ে না তো, সানাইবাঁশি ! ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। দেখি কোথায় কী—"

ভয় খেয়ে পিঙ্কি কান্নাটা গিলে ফেলে। আর বাকি তিনজন হাঁ-হাঁ করে ওঠে, "ও মজারুমামা, না না, যেও না গো ছোটমাসি তাহলে আমাদের বড় ঘেন্না দেবে। বলবে, 'এইটুকু আর বসিয়ে রাখতে পারলি না ? বলে গেলাম।' মজারুমামা, তোমার পায়ে পড়ি—"

"ফের ! ফের মজারু ? ঠ্যাং ধরে আছাড় মারব এক-একটাকে ! বলছি আমি হচ্ছি চোর-গোকলো, কোনো জন্মে কারুর মামা-ফামা নই।"

হঠাৎ সবাই চুপ করে যায়।

অন্ধকারের মধ্যে নেমে আসে একটা স্তব্ধতা।

আর একটু পরেই সেই অন্ধকার ভেদ করে বেশ দিলখোলা এক হা হা হাসি ওঠে।

"খুব ভয় পেয়ে গেছিস তো ? নাঃ, তোরা বাবা খুব চালাক ছেলেমেয়ে, কিছুতেই ঠকানো গেল না। পরীক্ষায় ফার্স্ট তো ! তা বোস, অন্ধকারে বসে গল্পই শোন্ একটা। তোদের ছোটমাসি তো সেই ছটা-নটা।"

ভারী মোলায়েম গলা এখন মজারুর !

ওঃ। বুকের পাহাড় নামল।

এতক্ষণ ধরে তবে এদের বুদ্ধির পরীক্ষা চলছিল। মজারু-মামা, যত পারে ঠকাবার চেষ্টা করছিল ! "হুঁ বাবা, আমাদের আর ঠকাতে হয় না।"

অতএব সমস্বরে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, গল্প গল্প। ততক্ষণে মা-ছোট-মাসিরা এসে যাবে।"

"বেশ, কিসের গল্প শুনবি !"

"ভূতের, ভূতের !" ফোটন আর ছোটন বলে ওঠে। কিন্তু পিঙ্কি আবার পুরনো রেকর্ড চাপায়। "না, নাআঁ। আমার

ভয় করছে।"

"ধ্যেত, একটা ভিতুর ডিম।" রিঙ্কি বলে ওঠে, "ওটাকে নিয়ে পারা যায় না।"

"তাহলে? রাজা-রানির?"

"এ মা! রাজা-রানির কী? আমরা কি বাচ্চা?"

"তাহলে? চোরের?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, চোরের, চোরের! কী রে পিঙ্কখুকি, চোরের গপ্পেও ভয় পাবি না তো?"

পিঙ্কি চোখ মুছে বলে, "না!"

"তবে শোন। এক গ্রামে এক চোর বাস করত। ভারী ভদ্দর-সজ্জন লোক। ওই চুরিটি ছাড়া আর কোনো দোষ ছিল না তার।"

"আহা, চোর আবার ভদ্দরসজ্জন কী গো?"

"কেন? হতে নেই? চুরিটা তার সাতপুরুষের পেশা। বাপ-ঠাকুর্দার কাছে আর-কোনো বিদ্যে শেখেইনি। তা ভদ্দর-সজ্জন হতে বাধা কী? তা যা করত নিয়ম-কানুন মেনেই। রাত বারোটা বাজলেই সিঁদকাঠিটি নিয়ে বেরিয়ে পড়া, আর ঠিক রাত চারটের মধ্যেই কাজকর্ম সেরে, ফিরে এসে পাতা-বিছানায় শুয়ে পড়া।

"চৌকিদারদের ডিউটির টাইম হচ্ছে রাত পৌনে বারোটা, আর ভোর সাড়ে চারটে।"

"পৌনে বারোটায় চৌকিদার জানলার বাইরে হাঁক পাড়ত 'গণেশদাস হো!'

"চোরমশাই সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিত, 'আছি আজ্ঞে। তামাক খাচ্ছি।'

'তামাক খাচ্ছিস তো ধোঁয়া কই?'

"চোরমশাই মুখে কালিঝুলির আঁক কাটতে কাটতে বলত, আজ্ঞে টিকে ভিজে গেছে।'

'ঠিক হ্যায়! ঘুমো ব্যাটা!'

"আবার চৌকিদারটা ভোর সাড়ে চারটের সময় এসে বাইরে থেকে হাঁক পাড়ত, 'গণেশদাস হ্যায়!'

"গণেশদাস তেল-ন্যাকড়া দিয়ে মুখের কালিঝুলি মুছতে মুছতে বলত, 'আজ্ঞে আছি বই কী! বিড়ি খাচ্ছি।'

'কেন ? কেন ? এত রাত্তিরে বিড়ি খাচ্ছিস কেন ?'

'আজ্ঞে জেগে থাকতে।'

"চৌকিদার বলত, 'কেন ? জেগে থাকার দরকার ?'

'এই আপনার ডাকে সাড়া দিতে। সাড়া না পেলেই তো কাল সকালে এসে চালান দিবেন।'

'হা-হা-হা। তা দিব। তবে দে, দুটো বিড়ি দে।'

"জানলা দিয়ে হাত বাড়াত।

"কিন্তু এত সাবধানেও কপালের ফেরে একদিন দুপুররাতে সিঁদকাঠি হাতে ধরা পড়ল গণেশদাস। ব্যস, দশ বছর জেল।"

"দ-শ বছ-র !"

"ওই তো মজা, তল্লাটের যেখানে যত চুরির কাণ্ড ঘটেছে, সব কেস তার নামে। রেগে-মেগে গণেশদাস জেলে ঢোকার আগে তার ছেলেকে বলে গেল, 'তুই আর রাতের কারবারে যাসনে! যা করবি দিনেমানে !'"

"এই বাবা ! তার ছেলে চোর নাকি ?"

"তা হবে না ? চোরের ব্যাটা চোর না হয়ে কি পুলিশ হবে ? বললুম না সাতপুরুষের পেশা। চুরি না করে উপায় কী ? ওই বিদ্যেটি ছাড়া আর তো কিছু শেখেনি। বাপ বলল, 'রাতের কারবারেই যত ফ্যাসাদ ! দিনে-দুপুরে ভাল ভাল জামা-জুতো পরে পাঁচজনের মাঝখানে ঘুরতে-ঘুরতে কাজ সাফাই করে বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে এসে রাস্তায় পাবলিকের ভিড়ে মিশে যাবি। বাপ-ঠাকুদ্দার মতন কুচিয়ে চুল ছাঁটতে হবে না। গায়ে প্যাচপেচিয়ে তেল মাখতে হবে না, মুখে কালিঝুলি মাখতে হবে না, তুই বা কে, রাজপুত্তুরই বা কে। শহরবাজারে এখন এই রেওয়াজ হয়েছে !'

"তা বাপ জেলে ঢুকে যাবার পর ছেলে সেই রেওয়াজে কাজ চালায়। তোফাই চালায়। হাল ফিরে রাজার হাল ! দিনমানে গটগটিয়ে ঢুকে আসে, দোকানে বাজারে লোকের বাড়িতে। চোখ রাঙিয়ে, মাল হাতিয়ে বেরিয়ে আসে। ট্যাক্সি ডেকে মালপত্তর চাপিয়ে হাওয়া হয়ে যায়। বেশ চলছিল...."

মজারুমামা একটু থেমে বলে, "কপালের ফেরে একদিন হল এক

বিপত্তি! বাঘা-বাঘা পুলিশদাদারা যাকে জব্দ করতে পারে না, সেই লোক কিনা দুটো কুচোকাচা ছেলেপেলের কাছে জব্দ বনে বসল। সব গুবলেট।"

"কী মজা! কী মজা!"

চটাপট হাততালি।

"ওরা বুঝি বুদ্ধি করে চোরটাকে ঘরে বন্ধ করে ফেলল?"

"ঘরে বন্ধ?" গল্প-বলিয়ে মজারু জোর গলায় বলে, "নিকুচি করেছে তোদের! ঘরে বন্ধ আবার একটা ব্যাপার। কেন, জানলার গ্রিল ওপড়ানো যায় না? শিক ভাঙা যায় না? আর বুদ্ধি? বুদ্ধিই বটে। যেন সবকটা এইমাত্তর স্বর্গ থেকে খসে পড়েছে।... ওসব কিছু না। কপালের ফের! তা একদিন দিনের বদলে সন্ধে, আর মক্কেলের বাড়ি ঢোকামাত্তর লোডশেডিং।"

"অ্যাঁ!"

"য্যাঃ!"

"ধ্যাত!"

"তুমি বুঝি বানাচ্ছ মজারুমামা?"

"বানাচ্ছি মানে? লোডশেডিং বলে কোনো জিনিস নেই? দেখিসনি কখনো?"

"না না, তা বলছি না!"

"বলছিস না তো চুপচাপ থাক! লোডশেডিং। তায় আবার আকাশে মেঘের ঘটা। সেকেলে চোরের মায়েদের ভিরকুট্টির অবস্থা! চোখ রাঙালেও দেখানো যাচ্ছে না। বাড়িতে গার্জেনরা সব হাওয়া। কিন্তু বাড়িতে রেখে গেছে ওই সর্বনেশে ডেঞ্জারাস কুচোকটাকে।...ব্যস। সবকটা একসঙ্গে ছিনে জোঁকের মতো লেগে চোরটাকে কিমা বানিয়ে ছাড়ল।"

"অ্যাঁ! কিমা!"

"সরি কিমা নয় মামা, মামা! তো চোর বেটার কাছে দুইই সমান। তিনকুলে যার একটাও বোন নেই, তাকে যদি গণ্ডাখানেক ভাগ্নে-ভাগ্নি রসোমালাই, ডিমের পাটিসাপটা, কাশ্মীরী গোকুলপিঠে খাওয়াতে বসে, আর মামা-মামা করে জীবন মহানিশা করে ছাড়ে, সেটা কিমা বানানো ছাড়া আর কী? কাজেই চোরটা..."

"ও মজারুমামা, গল্পটা তুমি বানাচ্ছ নাকি?"

"বানানো মানে? চোরটা যা করল, তাই বলছি। বিলকুল সত্যি!"

"কী করল গো?"

"কী করল? অনেক কষ্টে হাতানো মালপত্তরগুলো ছড়িয়ে ফেলে রেখে এমনি করে গটগট করে বেরিয়ে চলে গেল!"

"এ কী! এ কী! তা, তুমি চলে যাচ্ছ কেন?" ও মজারুমামা গল্পটার শেষ কী?"

আর শেষ! ছায়ামূর্তি'র টিকির ছায়াটিও নেই।

আর শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। ঠিক সেই মুহূর্তে কারেন্ট এসে গেল! বাড়ি আলোয় ঝলমল।

"ফোটন!"

"ছোটন!"

"ছোড়দা রে!"

"রিঙ্কি রে!"

"বারান্দায় ঝুঁকেও দেখতে পেলাম না রে দাদা।"

"আচ্ছা, আমরা কী দোষ করলাম বল তো?"

"কী জানি বাবা!"

"এবারে বোধহয় শরীর ভাল নেই মজারুমামার।"

"না রে। বোধহয় ছোটমাসিরা নেই বলে রাগ হয়েছে!"

"হতেই পারে!"

"কিন্তু এ কী?"

"এসব কী?"

"দালানে এসব কোত্থেকে এল?"

"এসব কী! এ-সব কী?"

বাইরের দরজা থেকে চেঁচাতে-চেঁচাতে আসছেন ফোটন কোম্পানির মা-বাবা-মাসিরা। "এর মানে কী? রাস্তার দরজা হাটপাট!" "সুশীল নিজের দরজায় ছেকল তুলে দিয়ে হাপিস!" "কী, হাপিস নয়? ঘরের মধ্যে বন্দী তুই?" "কী ব্যাপার? সিঁড়ি থেকে জিনিস ছড়ানো—এত দুষ্টুমিও মাথায় খেলে ওদের!"

চেঁচাতে চেঁচাতে উঠে আসেন ওঁরা। "এ কী! এ কী!"

তবে ওঁদের চেঁচানোয় কর্ণপাত না করে একগণ্ডা গলা চেঁচিয়ে উঠল, "এতক্ষণে আসা হল তোমাদের? এই একটু আগে চলে গেল মজারুমামা!"

"চলে গেল!"

"তা যাবে না তো কী তোমরা আসবে না, আলো আসবে না, ভাল্লাগে?"

"কিন্তু এসব কী?"

বড়-ছোট দুই বোন দালানে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকেন, "কিন্তু এসব কী ব্যাপার। ওরে বাবা আমার স্যুটকেসটা সিঁড়ির ধারে কেন? আলনার জামা-কাপড়গুলো মাটিতে জড়ো করা কেন? টেপ-রেকর্ডারটা দেরাজ থেকে বেরিয়ে এখানে এল কীভাবে? ফ্রিজটা হাঁ করে খোলা মানে কী? ওরে বাবা রে, মেজদি আমার নতুন কেনা শাড়িগুলো বাজারের থলের, মধ্যে ঠোসা! আমার যে মাথা ঝিমঝিম করছে গো।"

বলতে বলতে ঘরে এবং আর-একপ্রস্থ চিৎকার। "এ আবার কী? আলমারি ফাঁকা করে সর্বস্ব মাটিতে নামানো। ওরে সর্বনেশে ছেলেমেয়েরা, কী যে হচ্ছিল তোদের? রাম-রাবণের যুদ্ধ না কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড।"

বাবা গম্ভীরভাবে বলেন, "দেখে মনে হচ্ছে তৃতীয় মহাযুদ্ধের পত্তন এইখান থেকেই হল! দস্যিপনার একটা সীমা থাকবে না?"

মা'ও বলে ওঠেন, "সত্যি! হাঁ হয়ে যাচ্ছি।"

কিন্তু রিঙ্কি তো আর ছেড়ে কথা বলবার মেয়ে নয়। সে নিজস্ব স্টাইলে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, "আহা রে! আমরা এইসব করেছি! আমাদের ভারী সাহস! এ সবই তোমাদের মজারু-ভাইয়ের গজারু কাণ্ড! অন্ধকারের মধ্যে উনি ঘরবাড়ি আলমারি দেরাজ সব সাফ করছেন! হি-হি, আবার তিনি 'চোর-গোকুলো' হয়ে মালপত্তর হাতাচ্ছেন। উঃ, কম কাণ্ড করেছে মজারুমামা। আমাদের ঠকাতে? হরবোলা হয়ে দশরকম গলা করেছে। কিন্তু

পারল তো ঠকাতে? আমরা তেমনি বোকা নাকি? শেষ অবধি তোমাদের দেরি-ফেরি দেখে হঠাৎ রেগে গটগট করে চলে গেল। তবে খুব ভাগ্যি, ফ্রিজের খাবারগুলো সেঁটে গেছে চেটেপুটে।”

লোমহর্ষক

জলে ঘটি ডোবে না, তবু নাম তালপুকুর। জমিদারি নেই তবু বড় তরফ, ছোট তরফ। তরফ আছে, অতএব তড়পানিও আছে। দু'পক্ষের কর্তাতে কর্তাতে, গিন্নীতে গিন্নীতে দাসদাসী চাকর রাখাল আমলা গোমস্তাতে তড়পানির লড়াই চলে আসছে আজ সাতপুরুষ ধরে।

ছুতো একটা পেলেই হলো।

তা আজ পাওয়া গেছে এক জব্বর ছুতো। তড়পাচ্ছেন বড় তরফের সরকারমশাই। তারস্বরে প্রতিবাদ আর দাবি করছেন আওয়াজটা আগে শুনেছে ওদের রাখলা ছোঁড়া? বললেই হলো! প্রথম শুনেছি এই আমি। বুঝলেন! এই আমি শ্রীগুণাকর শর্মা। কাকপক্ষী তখনো বাসা ছাড়েনি, সূর্যিমামা লেপের নীচে, আমি হতভাগা লেপ কাঁথা ছেড়ে ছুটেছি মাঠে! গত রাত্তিরে ভোজনটা একটু গুরু হয়ে গিয়েছিল, তার খেসারত দিতেই সে যাক বিপদ থেকে উদ্ধার হয়ে ঘরে ফিরছি, হঠাৎ ওই বাজখাঁই আওয়াজ! বুকের রক্ত বরফ হয়ে গেল! এ তো গরু ঘোড়া ছাগল গাধার ডাক নয়, তবে কোন্ প্রাণীর হুংকার? দুর্গানাম জপ করতে করতে ছুটে আসছি, আবার সেই! কে যেন গরুর হাম্বা, ঘোড়ার চিঁহি, ছাগলের ব্যা—এ্যা—, গাধার ঘ্যাঁকোর ঘ্যাঁক্, সব কিছু মিশিয়ে হামানদিস্তেয় ছেঁচে পাঁচন বানিয়ে কানে ঢেলে ঢেলে দিচ্ছে!...শুনেছি গণ্ডারের আওয়াজ নাকি ভয়ানক, কলকাতায় সেবার 'সূর্যচূড়া যোগে'—গঙ্গাচ্চান করতে গিয়ে, চিড়িয়াখানাটাও দেখে এসেছিলুম, তা চোখেই দেখলাম গণ্ডার, হাঁক শুনিনি। ভাবলাম ছিটকে ছাটকে বুঝি তাই এসে পড়েছে কোথাও থেকে। উঠি তো পড়ি, পড়ি তো মরি, করে ফিরছি, দেখি বাড়ি আর খুঁজে পাইনে! অচেনা অচেনা সব উঠোন, ধান-গোলা ভাঙা কোঠাবাড়ি, এ কী বিপদ রে বাবা! বুঝতে পারলুম বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটেছি অন্য দিকে—।

'বেভ্যাস্ত! দেক্‌ভ্যাস্ত! হি হি হি!'

ছোট তরফের রাখাল ভজ মুলো মুলো দাঁত বার করে হেসে লুটোপুটি খায়, 'ছরকারমোসায়ের যে বাক্যি! উঃ! বেভ্যাস্ত, দেক্‌ভ্যাস্ত!'

'খবরদার ভজা, মুলোর বাজার বসিয়ে হাসবি না—'। সরকার-মশাই খিঁচিয়ে ওঠেন, 'পৈতে ছিঁড়ে ব্রহ্মশাপ দেবো।'

সরকারমশাইয়ের পরনে প্রায় শুকিয়ে ওঠা ভিজে গামছা, হাতে চকচকে করে মাজা পেতলের গাড়ু, পায়ে এক পা কাদা। আর চাম শুকনো দড়া পাকানো বুকে দোদুল্যমান সাত গিঁট দেওয়া ময়লা তেলচিটে ব্রাহ্মণ্যের পরিচয়টি। যখন তখন পৈতে ছিঁড়ে ব্রহ্মশাপ দেওয়ার ফলে, সরকারমশাইয়ের পৈতেয় এত গিঁট!

আর তেলচিটে!

সেটা হচ্ছে শ্রীগুণাকর শর্মার ঐতিহ্য। তাঁর মতে, 'পৈতে সাদা, বামুন গাধা!' চারটে পয়সা খরচ করে বাজার থেকে পৈতে কিনে যে গলায় ঝোলাবে, তার পৈতে ফরসা হবে। আমার এই যজ্ঞোপবীত হচ্ছে তিন সাততে একুশ পুরুষের মহিমার সাক্ষী! এর রং বনেদী হবে না?

কিন্তু ভজা ছোঁড়া ওই 'বনেদী'র মহিমার ধার ধারে না! পৈতেটার দিকে তাকিয়ে হি হি করে বলে, 'আর—ক' বার ছিঁড়বে গো ছরকারমোসাই? গিঁটে গিঁটে যে ছয়লাপ। বলি 'বোম্ভতেজ' দেখিয়ে ওই চাঁদ-সুয্যির দেশের পেরাণীটাকে ভস্ম করে দাও না? হ্যাঁ তবে বুঝি—।'

'তবে বোঝো! কেমন?' সরকারমশাই গাড়ু নামিয়ে তেড়ে আসেন, 'বলি লক্ষ্মীছাড়া বদমাশ ছোঁড়া, ওই পেরাণীটাকে ভস্ম করলে পুলিসে আমায় রাখবে? ওকে এখন পুলিসে নিয়ে গিয়ে বিলেতে চালান দেবে বুঝলি? সেখানে হিসেব-নিকেশ হবে প্রাণীটা চাঁদের না মঙ্গল গ্রহের। তারপর ওষুধে আরকে ভিজিয়ে ইয়া

মোটা জারে ভরে চিড়িয়াখানায় কি 'সুসাইটিতে' রেখে দেবে। কত তার মান্য খাতির। সে জায়গায় তাকে আমি ভস্ম করে রেখে দেব? অর্বাচীন আর কাকে বলে?...সে যাক—বড়বাবু, পুলিস এলে আমার নামটি আজ্ঞে বলে দেবেন। প্রথম দেখা প্রথম ডাক শোনা তার একটা মহিমা আছে তো? বিলেত পর্যন্ত দৌড়বে সে নাম।'

'দৌড়ুবে! ওনার নাম বিলেত পর্যন্ত দৌড়ুবে।' ভজ তেড়ে আসে, 'আমি অগ্রে হাঁক শুননু, আমি অগ্রে দেখনু—'

'তুই আগে দেখেছিস?'

সরকারমশাই গামছার খুঁট দুটো পেটের ওপর চেপে ধরে চিৎকার করে ওঠেন, 'বললেই হলো? একি মামদোবাজি নাকি? আমি আওয়াজ শুনে দিকভ্রান্ত হয়ে ছুটে যেতে গিয়ে—পড়বি তো পড় একেবারে ওটার সামনে! আর তুই কিনা—'

'থামো তো ছরকারমোসাই। বুড়ো হয়ে মরতে চললে, এখনো মিছে কথা রোগ গেল না। তোমার দেখার আগে আমি দেখে ছোটবাবুকে ডাকতে যাইনি? ছোটবাবু ত্যাক্ষুনি এসে গেল না?'

'নিশ্চয়!' ছোট তরফ ভরাটি গলায় বলে ওঠেন, 'আলবাত! ভজা যা বলছে, তার একবর্ণ ভুল নয়। ভজা আগে হাঁক শুনেছে, আগে দেখেছে, তারপর আপনার সরকার ফরকার।'

সরকার ফরকার! বড় তরফের সরকারের প্রতি এই অবজ্ঞা!

বড় তরফ এত অপমান সহ্য করবেন? তিনি তেড়ে উঠে বলেন, 'খবরদার ছোট! ছোট মুখে বড় কথা কইবি না বলে দিচ্ছি।'

ছোট তরফও সমান তেজে বলে ওঠেন, 'আপনি যখন বড় মুখে ছোট কথা কইছেন দাদা, তখন আমাকেই ছোট মুখে বড় কথাটা কইতে হবে। ওই অজানা প্রাণীটাকে আগে দেখার গৌরব আমার রাখাল ভজহরি ঘোষের! ও বেটা পেটের দাদ সারাবে বলে ঘাসের ডগা থেকে শিশির আনতে শেষ রাত্তিরে মাঠে বেরিয়েছে, শোনে ওই হাঁক! ভয়ডর তো নেই ছোঁড়ার প্রাণে, তাই এদিক ওদিক খুঁজে—।'

'হ্যাঁ কর্তা, ইদিক ওদিক খুঁজে দেখি উই ঝোপের আড়ালে পেরকাণ্ড পেরকাণ্ড দু'খানা ডানা ঝাপটে ঝাপটে পেরাণীটা আওয়াজ ছাড়ছে। কাছে গিয়ে বলেছি, 'কে! কে! আবার সেই—হাঁক! হবেই তো—মানুষের ভাষা তো আর প্রেচার হয়নি এখনো অন্য গেরোয়?'

অন্য গ্রহে মানুষের ভাষা প্রচার না হলেও, এই 'কুমড়োহাটা'র মত ক্ষুদ্দুর গণ্ডগ্রামেও চন্দ্র গ্রহ মঙ্গল গ্রহের বার্তা প্রচার হতে ত্রুটি হয়নি।

প্রচার বাতাসেই হয়।

ওই অতি প্রাকৃত আওয়াজসম্পন্ন ভয়ংকরদেহী এবং বিরাট দুখানা ডানা সংবলিত প্রাণীটা যে কোনো ভিন্ন গ্রহের, সে বিষয়ে বড় তরফ ছোট তরফ বড় তরফের প্রজাবৃন্দ এবং ছোট তরফের প্রজাবৃন্দ সবাই নিঃসন্দেহ।

পড়েছে সেট একটা ডোবার ধারে ঝোপের আড়ালে, সেইখান থেকেই ওই রামশিঙের মত প্রচণ্ড আওয়াজ করছে, আর বড় বড় দু'খানা ডানা ঝটপটাচ্ছে। কিন্তু এগোচ্ছে না একচুল!

'পা আছে বলে মনে হয় না—' ছোট তরফ একটু লেখাপড়া জানা, তাই তিনি বলেন, মঙ্গল গ্রহের খবর তো বৈজ্ঞানিকরা সব জেনেই ফেলেছেন। মঙ্গল গ্রহের নয়। মনে হচ্ছে শুক্র গ্রহের। শুক্র গ্রহেই এই রকম—'

বড় তরফ অবশ্য কথা শেষ করতে দেন না, তীব্র গলায় বলে ওঠেন, 'এই রকম! কেমন? শুক্র গ্রহে বেড়িয়ে এসেছিলি বুঝি? আমি বলছি,—এটা চাঁদের জীব। কোনো অতিকায় পাখি!'

'পাখির ওই ডাক?'

ছোট তরফ হেসে ওঠেন।

বড় তরফ আরো চটেন, 'আমি তো বলিনি ছোটো; কোকিল পাখি, কি ময়না পাখি। এ হচ্ছে অতিকায় পক্ষী। এই পৃথিবীতে যেমন আগের কালে অতিকায় হাতি ছিল, অতিকায় কুমির ছিল, তেমনি।'

ভজা সেই শেষ রাত্তিরে সাহস করে এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তখনো আবছা অন্ধকার, ঠিক ঠাহর হয়নি। তবু যেন মনে

হয়েছিল তার পাখির মত ছুঁচলো কিন্তু হাত দেড়েক লম্বা একটা ঠোঁট থাকলেও, আর তা'তে একরাশ রক্ত মত কী সব মাখা থাকলেও কালো ফেট্টি জড়ানো এক জোড়া পাও ওর ছিল মানুষের মত। পুলিস কি বড় সাহেবের আরদালীদের যেমন ফেট্টি জড়ানো থাকে। কিন্তু ভাল করে দেখার সুযোগ হয়নি।

এখন সবাই এসে পড়ার পর প্রাণীটা থেকে সবাই শতহস্ত দূরে আছে, বড় তরফের বাঁশঝাড়ের একখানা বাঁশ এবং ছোট তরফের বাঁশঝাড়ের একখানা বাঁশ লম্বালম্বি শুইয়ে রাখা হয়েছে, ওই শতহস্তের ব্যবধানে যাতে গণ্ডিটা না ডিঙিয়ে ফেলে কেউ। ভজা অবিশ্যি অনেকবার বলেছিল, 'সোম মঙ্গল বুধ বেস্পতি শুক্কুর শনি, কোনো বেটা, 'গেরোর' সাধ্যি নেই ভজার কিছু' করে। কিন্তু ওকে সবাই আটকেছে। তবু এখানে সেই আবছা দেখার অভিজ্ঞতা নিয়েই বলে ওঠে ভজা, 'পা নেই তা নয় আজ্ঞে। পা আছে এক জোড়া। পেরায় মানুষেরই মতন। তবে মনে হলো— যেন ফেট্টি বাঁধা।'

ভজা ছোট তরফের লোক আর ছোট তরফই ঘোষণা করেছেন পা নেই, তাই ভজার এই মুখ্যুমিতে জ্বলে গিয়ে ছোট গিন্নী ওপাশ থেকে ঘোমটার আড়াল ভেদ করে ডাকেন, 'ভজা!'

ভজা প্রমাদ গনলো।

গুটি গুটি এগিয়ে গেল। ছোট গিন্নী কড়া গলায় বললেন, 'আবোল তাবোল বকছিস কেন? ছোটবাবু বলছেন পা নেই আর তুই বলবি পা আছে?'

'আজ্ঞে, আছে, এমন কথা তো নিয্যস করে বলি নাই ছোট মা! বলছি পায়ের মতন আছে। তাছাড়া—ফেট্টি জড়ানো কে অত বোঝে?'

'হ্যাঁ, সেই হচ্ছে কথা। কেউ অত বোঝে না যখন, তখন ছোট-বাবু যা বলবেন তাই বলবি।'

'আজ্ঞে তাই বলবো'—বলে ভজা সরে এসে বলে, 'পা আছে একথা আবার কে কখন বলেছে? আছে শুধু পেল্লায় দুটো ডানা।'

ডানা যে আছে তা বোঝা যাচ্ছে। প্রাণীটা যেন মাটিতে

গড়াগড়ি খাচ্ছে আর ডানা দুখানা ঝটপট করছে।

আর থেকে থেকে সেই—পাঁচন!

সেই ভয়ংকর ধ্বনি!

শুনে—

একশো হাত দূর থেকে দুশো হাতে ছিটকে যাচ্ছে সবাই। অথচ একেবারে জায়গাটা ছেড়ে যাবার চিন্তামাত্র নেই কারুর।

যে সব গিন্নীরা ভোরবেলা উঠে পুজোপাঠ করেন, তাঁরা থেকে শুরু করে, যে গিন্নী বড়ির ডাল ভিজিয়ে রেখেছেন, কি পিঠে-পুলির চাল ভিজিয়ে রেখেছেন, তিনিরা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছেন। বউ ঝি ছোটোমোটোদের তো কথাই নেই।

একটা হেস্তনেস্ত হোক ওর, তবে একপা-ও নড়বে সবাই।

এখন হেস্তনেস্তটি হবে পুলিস এলে। পুলিস ডাকতে যাওয়া হয়েছে! দু' তরফের লোকই গেছে। বড় তরফের লোক গেছে গরুর গাড়িতে, ছোট তরফের লোক সাইকেলে।

দু' জনের দু' ভরসা।

ছোট তরফের ধারণা—তাঁর খবরটা আগে পৌঁছবে, অতএব মুখোজ্জ্বলটা তাঁর।

বড় তরফের ধারণা, ওদের কাছে খবরই পাবে দারোগা, বাই-সিকেলের পেছনে ব'সে তো আর আসবে না। এ বাবা ছই দেওয়া গরুর গাড়ি! শুনবে, আর চড়ে বসবে। হুঃ বাব্বা!

ওদিকে ছোট তরফের দাসী মানদা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'হ্যাচোং হ্যাচোং গো গাড়িতে চেপে সাত মাইল পথ আসতে দারোগার দায় পড়েছে! ছাইকেলের পিছুতে চড়বে, আর বোঁ করে এসে যাবে।'

বড় তরফের দাসী মোক্ষদা গলা তুলে বলে ওঠে, 'ছাইকেলের পিছেয় চড়তে দারোগার দায় পড়েছে, তাকিয়া ঠেস দিয়ে ছিগ্রেট্ টানতে টানতে আরামসে আসবে।'

'তুই থামবি মোক্ষদা?'

'তুই চুপ করবি মানদা?'

'আকাশ থেকে জন্তু পড়েছে তোদের মাঠে না আমাদের মাঠে?'

মোক্ষদা খরখরিয়ে ওঠে, 'শোনো কথা. ডোবার ধার পর্যন্ত

আমাদের না ?'

দু'জনে তুমুল ঝগড়া বেধে যায়।

ঝিয়েদের ঝগড়ায় কত্তাদের টনক নড়ে। তাই তো!

কে আগে দেখেছে সেইটা নিয়েই মাথা ঘামানো হচ্ছে, কার জমিতে পড়েছে সেটা তো খেয়ালে আসেনি।

ছোট তরফ সতেজে বলেন, 'ডোবার পশ্চিম ধারটা অবধি আমার!'

বড় তরফ চেঁচিয়ে বলেন, 'ছোট মুখে পাকা কথা কসনে ছোটো। ডোবার নৈর্ঋত কোণটা আমার তা মনে রাখিস। আজন্মকাল ওইখানে আমার তরফের বাসন মাজা হয়।'

'বলি ঝোপে তো আর বাসন মাজা হয় না গো দাদা, ঝোপটা কার? বলি ঝোপটা কার?'

ঝোপটা কার তাই নিয়েও ঝগড়া বাধছিল। হঠাৎ আবার সেই চিৎকার! গরুর হাম্বা, ঘোড়ার চিঁহি, ছাগলের ব্যা—আর গাধার ঘ্যাঁকোর ঘ্যাঁ মিশ্রিত ধ্বনি।

'জানোয়ারটার খিদে লেগেছে'—

ভজহরি কথাটা আবিষ্কার করে। 'কোনকালে কখন উড়ো জাহাজ ভেঙে পড়েছে না কি হয়েছে কে জানে, খিদে লাগতে পারে। রক্তমাংসর শরীল তো বটে।'

গুণাকর শর্মা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পরিশ্রান্ত হয়ে এখন গাড়ুটার ওপরই চেপে বসে পড়েছিলেন, প্রতিপক্ষ ভজহরির মন্তব্যে তেড়ে ওঠেন, 'রক্ত-মাংসর শরীর! বলেছে তোকে! আকাশের জানোয়ারের রক্তমাংস থাকে?'

ভজাও সতেজে জবাব দেয়, 'না থাকুক রক্তমাংস, কাঠ-পাথরই থাকুক, দেহ থাকলেই খিদে থাকবে, এই হচ্ছে সারকথা।'

'তবে খাওয়া!' সরকার বিদ্রুপের গলায় বলেন, 'গাই দুইয়ে দুধ জ্বাল দিয়ে খাওয়া। এত যখন দয়ার প্রাণ!'

'দয়া নির্দয়া বুঝি না ছরকারমোসাই, আমি আগে দেখেছি, কোত্তব্য আমার। পেরাণীটা খিদেয় ধরফড়াচ্ছে, ওকে খাওয়ানোর চিন্তা আমাকেই করতে হবে।'

'ফের বলছিস ভজা, তুই আগে দেখেছিস?'

'একশো বার বলবো ! হাজার বার বলবো ।'

'পৈতে ছিঁড়ে ব্রহ্মশাপ দেবো ভজা ।'

'গামছা-পরা বামুনের বোম্ভশাপ লাগে না হে ছরকার !'

'ভজা তোর মরণ পাখা উঠেছে !'

'তা আজ্ঞে উঠেছে বোধহয় । তবে মরণই যদি হয়, তো ভয়টা ঘোচে । বড্ড ইচ্ছে মরণকালে তোমায় একবার কামড়ে মরি ।'

ছোট তরফ একটু মিষ্টি বকুনি ঝাড়ে, 'কী ফাজলেমি হচ্ছে ভজা ? বরং ওকে যে কিছু খাওয়াবার কথা বলছিলি—'

'আপনারা যে কাছেই যেতে দিলেন না । নইলে এতক্ষণে ওর সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলতুম !'

'ভাব জমিয়ে ফেলতুম !'

সরকারমশাই খিঁচিয়ে ওঠেন, 'তুই ওর ভাষা জানিস, না ?'

'ভাষা ফাসা বুঝিনে ছরকারমোসাই । পেরাণটা বাড়িয়ে দিলেই ভাব জমে যায় এই হচ্ছে সাদা বাংলা । বলি বুধি মুংলি লক্ষ্মী ভগবতী, এদের ভাষাই কি জানি আমি ? না ওরাই জানে আমার ভাষা ? তবু গপ্পোটা জমে না ওদের সঙ্গে ? মনের পেরাণের সুখদুক্ষুর কথা হয় না ?'

'বুধি মুংলির সঙ্গে তোর সুখদুক্ষুর কথা হয় ? হা হা-হা ! পাগলটা কি বলে গো ছোটবাবু ?'

ছোটবাবু কি বলতেন কে জানে, ইত্যবসরে দারোগা এসে পড়লেন জিপে চড়ে । গরুর গাড়ি পৌঁছয়নি, চলে এসেছেন সাইকেলে খবর পেয়েই ! সাইকেল ছোট তরফের ।

ভজ তাই সগৌরবে বলে ওঠে, 'যার কম্মো তারে সাজে, অন্যলোকে লাঠি বাজে । ছাইকেলের কাছে গরুর গাড়ি ! এখন দারোগাটি আমাদের ভাগে পড়েছেন এই আহ্লাদ ।'

সরকারমশাই দারোগা দেখে গামছা বদলে ধুতি পরতে ছুটেছেন, তাই আহ্লাদের জবাব দিয়ে যেতে পারেন না । শুধু পৈতেটা একবার ছিঁড়ে অভিশাপের মন্ত্র ছুড়ে, আবার তা'তে গিঁট দিতে দিতে ছোটেন ।

কিন্তু ওসব এখন দেখছে কে ?

দারোগা এসে গেছে এইবার রহস্য ভঞ্জন হবে । অতএব মেয়ে

পুরুষ ছেলে-বুড়ো সবাই ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে আসে।

দারোগা তাঁর সহকারীকে বলেন, 'দূরবীনটা এনেছ?'

'হুঁ্যা স্যর!'

'ঠিক আছে। হুঁ্যা বলুন আপনাদের বিবরণ! প্রথমে কখন কি ভাবে—ও কি? অঁ্যা।'

দারোগা লাফ দিয়ে ভিড়ের পেছনে চলে আসেন।

'ওই তো স্যর—' ছোট তরফের দাবি অগ্রে, তাই তিনি সগর্বে এগিয়ে এসে বলেন, 'ওই তো। অনবরত ডানা ঝট্‌পটাচ্ছে, ভূমিতে গড়াগড়ি দিচেছ, আর থেকে থেকে ওই আওয়াজ ছাড়ছে।'

হঠাৎ ছুটে পালিয়ে লজ্জায় পড়ে গেছেন দারোগাবাবু, তাই হঠাৎই ডাঁট দেখিয়ে বলে ওঠেন, 'তারপর? বিবরণটা কী? কখন কি ভাবে কে দেখলো?'

'আজ্ঞে কত্তা—আমি আগে দেখেছি!' ভজ একগাল হেসে বলে, 'ওই নিয়ে ছরকারমোসায়ের সঙ্গে খুনোখুনি!...বলে কিনা আমি অগ্রে। আমি বলি বললেই হলো?'

'থামো, বকবক কোরো না। প্রথম কেমন দেখলে? উড়োজাহাজ ভেঙে পড়লো?'

'কও কত্তা। উড়োজাহাজ আবার ভাঙলো কখন?'

'তবে?'

'তবে আবার কি? আপনি যা দেখছো আমিও তাই দেখছি। এতাবত কাল ভোরবেলা থেকে সক্কল লোক একই দেখছে। চেঁচাচেছ আর ডানা ঝটপটাচেছ।

'তার মানে ছিটকে এসে পড়েছে। গণপতি, কালকের খবরের কাগজে একটা প্লেন ক্র্যাশের খবর বেরিয়েছিল না?'

গণপতি দারোগার সহকারী।

চটপটে ছোকরা।

তাড়াতাড়ি বলে, 'সে তো স্যার—মস্কোয়।'

'তাতে কি?' দারোগা ধমক দিয়ে বলেন, 'প্লেন ক্র্যাশ করলে কোথাকার মাল কোথায় ছিটকে যেতে পারে, জানা আছে তোমার? মস্কোতেই তো হবে? অন্য গ্রহে রকেট পাঠাচেছ কারা? এই যে গ্যাগারিন বেচারা মারা পড়লো, কাদের দেশের?...ওরাই দিয়েছে

রকেট ছঁুড়ে, রকেট বেটা কোন না কোন গ্রহে গিয়ে একটা প্রাণীকে লটকে নিয়ে এসেছে। এ নিয়ে পৃথিবীব্যাপী একটা তোলপাড় কাণ্ড হবে বুঝলে গণপতি ?'

গণপতি চটপট জবাব দেয়, 'আজ্ঞে স্যর তা' আর বলতে ? এই অখ্যাত কুমড়োগাছা গ্রাম পৃথিবীবিখ্যাত হয়ে যাবে। আর আমাদেরও একটা বড় রকমের উন্নতি টুন্নতি হয়ে যাবে মনে হয়। এখন কথা হচ্ছে ওটার কাছাকাছি এগোনো হবে কি না।···হেড অফিসে একটা ভালমত 'ডেসক্রিপশান' পাঠাতে হবে তো ? তাছাড়া কাগজের অফিসে অফিসে—'

ভজা ছোট তরফের কানের কাছে ফিস ফিস করে বলে, 'যা শুনছি বাবু মনে হচ্ছে এই কুমড়োগাছায় এখন মেলাই র‍্যালা চসবে, দেশ-দেশান্ত থেকে লোক আসবে, তাঁবু গাড়বে, এলাহি কাণ্ড চলবে। মেলার মাঠে একটা তেলেভাজার দোকান দিলে কেমন হয় বাবু ?'

ছোট তরফ ভজার দূরদর্শিতায় চমৎকৃত হয়ে লাফিয়ে উঠে বলেন, 'ভজারে তুই মরে গেলে তোর মগজের ঘিলুটা বোতলে ভরে বিলেত পাঠিয়ে দেব। কথার মতন কথা বলেছিস একটা। শুধু তেলেভাজা নয়, ওই সঙ্গে চা-ও। সাহেব সুবোরাও আসবে তো ?'

মনে মনে ভাঁজতে থাকেন ছোট তরফ দোকানটাকে।

ইত্যবসরে সরকার মশাই বড় তরফকে প্রস্তাব দিচ্ছেন, 'এই বেলা গবরমেণ্টকে একটা জানান দিন বাবু, ওই ঝোপটা আপনার। আর সঙ্গে সঙ্গে ওই বেমক্কা জানোয়ারটার জন্যে একটা দাম খাড়া করে ফেলুন। বলবেন, আমার জমি, আমার দাবিদাওয়া, দাম না ছাড়লে মাল ছাড়ছি না।'

এখানে এইসব চলছে, ওদিকে দারোগা সাহেব দূরবীন চোখে লাগিয়েই সপাটে মূর্ছা ! তাঁর মুখ দিয়ে শুধু আঁ-আঁ শব্দ বেরোচ্ছে।

গণপতিই অগত্যা দূরবীনটা বাগিয়ে ধরেছে। সকলেরই হাত নিশপিশ করছিল ওই যন্ত্রটার জন্যে, কিন্তু গণপতি এমন ছেলে নয় যে হাতছাড়া করবে।

গণপতি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সামনে এগিয়ে পেছনে হটে, অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ পর্ব শেষ করে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'লেখাপড়া জানা লোক

কে আছেন এখানে ?'

'লেখাপড়া জানা !'

ছোট তরফ বড় মুখ চাওয়াচায়ি করেন।

হঠাৎ 'লেখাপড়া জানা'র প্রশ্ন কেন ?

কতদূর 'জানা' চায় ?

'আমরা আছি' বলে অপদস্থ হতে হবে না তো ?'

তা ইতিমধ্যে ভজ জবাব দিয়ে বসে আছে, 'আবার কে আছে ছোটবাবুমোসাই ছাড়া ? আর সবাইর তো পেটে বোমা মারলে 'ক' বেরোয় না।'

'বোমার কথা কী হচ্ছে ?'

দারোগা সাহেব গোঙিয়ে চেঁচান।

'কিছু না'—গণপতি বলে, 'তাহলে ছোটবাবুই একটা কাগজ পেনসিল ধরুন, আমি বলে যাই, আপনি লিখে ফেলুন।....বিবরণটা নিখুঁত হওয়া দরকার, হেড অফিসে পাঠানো হবে। তারপর আপনার গিয়ে ফটোগ্রাফার আসবে—'

ভজা 'হায় হায়' করে বলে ওঠে, আজ্ঞে ছোট দারোগাবাবু এত কাণ্ড করবেন, আর পেরাণীটাকে কিছু খাওয়াবেন না ? আপনার ফটোগেরাপ কোম্পানি আসতে তো অক্কা পেয়ে পচে গলে যাবে ও।'

গণপতি তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, 'আপনাদের এই গ্রামে কথার চাষটা বড় বেশী দেখছি মশাই। ওকে একটু থামতে বলুন তো। মর্ত্যলোকের মানুষেরই মরদেহ। অর্থাৎ মানুষ মরণশীল। কিন্তু ভিন্ন গ্রহের ব্যাপার আলাদা। দেখছেন তো মহাশূন্যের কোন কোণের থেকে ছিটকে এসে পড়েও মরেনি. গাঁক গাঁকানির চোটে কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে।'

কথাটা সত্যি।

বাস্তবিকই পাখি অথবা জানোয়ারটা এখন নন্‌স্টপ চেঁচিয়ে যাচ্ছে। যেন কিছু একটা বলতে চায়. কিছু একটা বোঝাতে চায়।

আহা ওর ভাষাটা যদি বোঝা যেত ! সবকিছু জলের মত সোজা হয়ে যেত। কিন্তু ভাষা নিয়েই তো যত গণ্ডগোল। একা এই ভারতবর্ষেই উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম ঈশান অগ্নি নৈঋত বায়ু

ঊর্ধ্বঃ অধঃ—এই দশদিকের ছাড়াও দিকে দিকে আরও কত ভাষা। কেউ কারোটা বোঝে না। আর এ তো ভিন্ন গ্রহের ব্যাপার মানুষ কি পাখি, পাখি কি জন্তু, বোঝবার উপায় নেই।

উপায় নেই, তবু বুঝতে হবে, বোঝাতে হবে। তাই গণপতি প্রবলকণ্ঠে ঘোষণা করে চলে, 'লিখে নিন বৃহদাকার প্রাণী। পাখির ধরনের কিন্তু বিভৎস মুখ। চার পাঁচ ফুট লম্বা ঠোঁট, লিখছেন?'

ছোট তরফ ব্যতিব্যস্ত গলায় বলেন, 'ঝড় বইয়ে বললে চলবে কেন স্যর? একে একে বলুন—'

'একে একে? ওঃ!'

গণপতি মুচকি হেসে বলে, 'তা একে একেই বলছি, যাতে বানান করে নেবার সময় পান।

এক নম্বর হচ্ছে—বৃহদাকার প্রাণী। 'হাতিমি', বা বকচ্ছপ' জাতীয় কিছু বিভৎস দেখতে।

দুই—মুখের গড়ন অনেকটা পাখির মত।'

ছোট তরফ তখন 'বকছপ' টুকু বাগিয়ে আনছেন, বলেন, 'মুখের গড়ন কি বললেন?'

'মুখের গড়ন পাখির মতন।'

'এই লিখলাম—মুখের গড়ন '

'তিন—প্রায় চার ফুট লম্বা শক্ত ঠোঁট। অনেকটা গরুড়ের মত। মনে হয় গরুড়ের জ্ঞাতি ট্যাতির বংশধর।'

'এই লিখলাম গরুড়ের বংশধর।'

'আহাহা খোদ গরুড়ের কেন? গরুড়ের জ্ঞাতির—'

'ওই জ্ঞাতি কথাটা বাদ দিন স্যর। লিখতে সময় লাগবে। আর জ্ঞাতি জিনিসটাও বদখত গোলমেলে।'

'ওঃ তাই নাকি?' গণপতি হেসে উঠে বলে, 'আচ্ছা, সট্‌কাট করছি—চার নম্বর হচ্ছে ঠোঁটে রক্তমাখা।'

'ঠোঁটে রক্তমাখা।'

'পাঁচ—বৃহৎ দুখানা ডানা—'

'লিখলাম বৃহৎ দুখানা ডানা।'

'ছয়—হাত নেই।'

'হাত নেই।'

'সাত—পা আছে।'

'পা আছে।'

'পায়ে কালো কাপড়ের ফেট্টি জড়ানো।'

'পায়ে কালো ফেট্টি।'

'আট—গায়ে বহু বর্ণের পালক। অনেকটা—'

'দাঁড়ান মশাই—'ছোট তরফ প্রায় বকে ওঠেন, 'বহু বর্ণটা লিখে নিতে দিন আগে। হ্যাঁ, হয়েছে। বলুন এখন অনেকটা কি?'

'অনেকটা ওই যে ঘরঝাড়া পালকের ঝাড়ু থাকে? গায়ে তার মত লম্বা লম্বা গোছা গোছা পালক।'

'লিখলাম গোছা গোছা লম্বা লম্বা—'

'নয়—অবিরত শরীরের ওপর দিকটা মাটিতে ঘষটে উলটে পালটে ছটফট করছে—'

'করছে—'

'দশ—বিভীষণ আওয়াজ ছাড়ছে।'

'আওয়াজ ছাড়ছে।'

'এগারো—এখন কিং কর্তব্য?'

'এখন কিং কর্তব্য!'

'ঠিক আছে এখন সই করুন।'

'ঠিক আছে এখন—'

'আহা হা কী আশ্চর্য্য।' গণপতি বলে, 'ওটা আবার লিখছেন কেন? কাগজটায় সই করতে হবে, সেই কথাই হচ্ছে।'

'আচ্ছা।'

ছোট তরফ নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন।

সইটা করে ফেলেন।

এরপর দূরবীনটার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। সকলেই একবার করে কাকুতি মিনতি করতে থাকে।

তবে গণপতি লোক বুঝে দু' একজনকে দেয়। দারোগা এবার ওঠেন, কড়া গলায় বলেন, 'সরকারি যন্তরটা খেলা করবার নয় গণপতি। দাও আমাকে।'

'আপনাকে! আপনি যদি স্যর আবার—'

'থামো!' দারোগা জিনিসটা পকেটে পুরে ফেলে গম্ভীর গলায় বলেন, 'আমি যাচ্ছি কাগজের অপিসে সংবাদটা দিতে। যতদূর মনে হচ্ছে ওটা ওই গরুড় পক্ষীরই জাত। তার মানে

চন্দ্রলোক শুক্রলোক নয়, স্রেফ গোলোকের ব্যাপার। বোঝাই যাচ্ছে অমর। নচেৎ মহাশূন্য থেকে আছড়ে পড়েও—কিন্তু অনবরত অমন ছটফট করছে কেন?'

গণপতি বলে, 'ওটাই বোধহয় ওদের নেচার স্যর। ওটাও বরং লিখে দিন। ওই থেকেই বৈজ্ঞানিকরা—ওঃ কী আওয়াজরে বাপ!'

হ্যাঁ এবার যেন মাত্রাছাড়া আওয়াজ ছাড়ছে।

'ঘ্যাঁকো ঘ্যা ...চিঁ হি হিঁ, হাম্বা হাম্বা ব্যা—এ্যা ছাড়াও যেন হুক্কাহুয়া, কোঁকোর কোঁ...ঘো ঘো সব কিছু এসে মিশেছে।'

'ইস! যদি একটা টেপরেকর্ডার থাকতো!' গণপতি আপসোস করে।

বড় তরফ বলে ওঠেন, 'আমার বড় শ্যালার মেয়ের ভাগ্নের বাড়িতে আছে ও বস্তু।'

'আছে না কি? কোথায়? কোথায়?'

'আজ্ঞে দিল্লীতে।'

'দিল্লীতে!'

গণপতি একটি অবজ্ঞার দৃষ্টি হানে। আর ঠিক সেই সময় ওই ভয়ংকর আওয়াজ ছাপিয়ে একটি মনুষ্যকন্ঠ উদ্দন্ড নৃত্য করতে ছুটে আসে। কোথায় সে? কোথায় সেই লক্ষ্মীছাড়া পাজী গোভূত মামদো। দেখে নেব তাকে আমি। আমাকে রাম ফাঁসানো ফাঁসিয়ে, উনি এখানে গোলক বৈকুন্ঠের স্বর্গপক্ষী সেজে মস্করা করছেন। বেটা তামাক সাজা চাকর, বহু ভাগ্যে একদিন জটায়ু সাজতে পেয়েছিলি, সাতপুরুষে তরে যা। তা নয় উনি মজাজ দেখাতে এলেন। রাবণের লাথি খাবেন না। আয় তোকে আমি ছাল ছাড়িয়ে ছাড়ি—।

ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে আসেন নন্দন নবনাট্যের প্রোপ্রাইটার জগন্নাথ বাগ। হাতে একখানি বেত। এগোতে থাকেন বাঁশটাঁশ ডিঙিয়ে ঝোপের দিকে।

'আরে আরে ওকী করছেন! ওদিকে যাবেন না, ওদিকে যাবেন না, ওদিকে যাবেন না—' বলে হই হই করে ওঠে সমগ্র কুমড়ো গাছাবাসী।

কিন্তু জগন্নাথের দৃক্‌পাত মাত্র নেই। তিনি বেত নাচাতে নাচাতে এগিয়েই চলেন। মুখে সেই বুলি, 'বেটা হরিপদ তামাক সেজে হাতে কড়া-পড়া, স্টেজে উঠে তোমার অহংকার বেড়ে গেল না? 'রাবণের হাতের মার খাবোনা! রাবণটা আমার জ্ঞাতি ভাইপো!' বেশ খা তবে আমার হাতের মার।"

সমগ্র কুমড়োগাছাবাসী হুড়মুড়িয়ে এগিয়ে যায় জগন্নাথ বাগের পিছু পিছু। একজন যখন সামনে আছে ভয় কি। ডানার ঝাপটা লাগে তার লাগবে।

তবে নিঃশব্দে এগোচ্ছে না কেউ।

সকলের মুখে এক কথা, 'ব্যাপারটা কি মশাই? ব্যাপারটা কী?'

'ব্যাপার?' জগন্নাথ বাগ ঘুরে দাঁড়ান।

"ব্যাপার' একেবারে যাচ্ছেতাই ওই বেটা হরিপদ বহুভাগ্যে জীবনে একদিন একটা পার্ট পেয়েছিল। 'জটায়ু বধ' পালায় জটায়ুর পার্ট। আসল জটায়ুর হঠাৎ জ্বর হওয়ায়—সে যাক, সাজানোর লোক সাজিয়ে টাজিয়ে তো দিল বেটাকে, টিনের ডানা টিনের ঠোঁট, পালকের কোট মুখোসটুখোস সব কিছু দিয়ে, পা দুটো পর্যন্ত ন্যাকড়া পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঠিক পাখি পক্ষীর মত করে দিল, মুখের সামনে—ঠোঁটের মধ্যে যন্তর বসিয়ে আওয়াজ দিল, বাবু দয়া করে 'বধ' হতে স্টেজে উঠলেন। দেখে মশাই বেশ বিশ্বাস এল। মিথ্যে বলব না রারণের সঙ্গে যুদ্ধটাও মন্দ করল না, তারপরই ঘটে গেল ঘটনা।····রাবণ যখন ওর মুখে তীর মেরে তার সঙ্গে আলতার শিশি ঢেলে দিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড করে, মাটিতে ফেলে দিয়েছে, একখানি নাগরার গুঁতো, গোভূত কিনা তেড়ে গা ঝেড়ে উঠে ধাঁই ধাঁই করে রাবণকে গোটাকতক লাথি ঝেড়ে গাঁক্ গাঁক্ করে ছুট! বলুন! বলুন মশাই কী অবস্থা তখন আমার! পুরো নাটকটাই মাটি। লোকের হাসির দাপটে—উঃ! এতদিন জীবনে এমন মাথাকাটা ঘটনা ঘটেনি আমার! হইচই লণ্ড ভণ্ড কাণ্ড! সেই ফাঁকে বেটা যে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল! এখন দেখছি একেবারে ভেন্ন গাঁয়ে!···পরে 'সীতার' মুখে শুনি বেটা নাকি আগে থেকে শাসিয়ে রেখেছিল, ভাইপো ব্যাটা যে রাবণ সেজে

আমায় পিটোবে, সেটি সহ্য করবো না। যুদ্ধ করে করুক, কিন্তু 'আসল' জটায়ুকে যেমন নাগরার গুঁতো দেয় তেমনটি দিতে এলেই বাছাধনকে বাবার বিয়ে দেখিয়ে দেব।...আমি কি মশাই জানি তা? তাহলে ওকে স্টেজে তুলি ...যাক আয় আজ তুই বেটা হরিপদ, তুই যেমন আমার নাটকের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিস, তেমনি তোর বারোটা বাজাই।"

জগন্নাথ বাগ ছেড়ে গিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে গরুড়ের জ্ঞাতির বংশধরকে টেনে বার করে তার সেই ফুট চারেক লম্বা ঠোঁটটা ফট্ করে টেনে খুলে দিতেই—স্বর্গপক্ষী মানুষের গলায় হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলে, 'টানবেন না কর্তা টানবেন না। দুখানা হাঁটুই ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে। উঠতে পারছি না, খালি কাতরাচ্ছি।"

ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে। কাতরাচ্ছি।

তার মানে!

মানেটি জলের মত। দিকবিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে ছুটতে রাতের অন্ধকারে বেঘোরে কাঁটা ঝোপে আছাড় খেয়ে হাঁটু ভেঙে 'দ' হয়ে পড়ে আছেন বাবাজীবন। এদিকে হাত পিছমোড়া করে ডানার সঙ্গে বাঁধা। হাত নাড়তে গেলে শুধু ডানাই নাড়ছে। অতএব মুখের চোঙা ঠোঁটটিও নাড়বার সামর্থ্য নেই। কথা কইলেই রামশিঙে ফিট্ করা চোঙের মধ্যে থেকে শুধু আওয়াজ বেরিয়ে আসছে বিকট বীভৎস, কিম্ভূত।

তুলে ধরে দাঁড় করানো গেল না হরিপদকে, পিঠের ডানা, গায়ের পালকের আলখেল্লা ছাড়িয়ে নিয়ে জগন্নাথ বাগ তাকে গরুর গাড়িতে তুললেন। বললেন, 'দাঁড়া হাসপাতাল থেকে তোর পা আগে সরাই তারপর আবার ওই পা যদি বাঁশ পিটিয়ে না ভাঙ্গি তো আমি জগন্নাথ বাগ নই।'

এতবড় একটা লোমহর্ষক কাণ্ডের কিনা এই পরিসমাপ্তি।

দারোগা সাহেব জিপে উঠে বলে যান, 'অকারণ পুলিসকে হ্যারাস করবার জন্যে আপনাদের নামে 'কেস' হবে বুঝলেন?'

জগন্নাথ বাগ জিপের ধুলো থেকে নাক-বাঁচাতে কোঁচার খুঁট তুলে নাকে চেপে বলেন, 'আপনাদেরও মশাই বলিহারি! এরা না

হয় মেঠো মানুষ, বলি আপনারা তো রাজা জমিদার? এখনো শুনতে পাই দু তরফের রেষারেষির কামাই নেই! আপনারা কিনা ওই টিনের ঠোঁঙা আর পালকের কোট দেখেই ভয়ে একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলেন?'

জ্ঞানশূন্য।

রেষারেষি!

হঠাৎ ছোট তরফ বড় তরফের গলা ধরে ঝুলে পড়ে হা হা করে হেসে ওঠেন, 'ও দাদা, এ বলে কি? তোমায় আমায় রেষারেষি? হা হা হা!

বড় তরফও ছোটর গলা ধরে হেসে ওঠেন, 'ভয়ে জ্ঞানশূন্য? হা হা হা! ভয়ে জ্ঞানশূন্য! আমরা তো একটু বরং তামাশা দেখছিলাম মশাই! কী বলিস ছোট?'

'তা আর বলতে দাদা! হা হা হা।'

তখন সরকার মশাই আর ভজার মধ্যে হাসির প্রতিযোগিতা চলে, হা হা হা! এটাও বুঝলেন না আজ্ঞে অধিকারী মশাই? কে না বুঝেছে এটা স্রেফ রং তামাশা!'

বড় গিন্নীও হেসে কুটি কুটি।

'সত্যি দিব্যি রং তামাশা দেখা গেল সকাল বেলা! বিনি পয়সার জটায়ু বধ!'

—বললে তোরা মানিস, আর না মানিস, আমি বলছি এ বিষ্টি ভগবানের নিয়মকাননের বিষ্টি নয়।

ভিজে গামছাখানা জোরে ঝাড়তে ঝাড়তে আরো জোরে ঘোষণা করেন মেজঠাকুমা পাঁজী পুঁথিতে লিখেছে, এখন প্রলয়ের কাল এসে গেছে। বলি দেখেছে কেউ সে লেখা? তবে? তবু এক নাগাড়ে চারদিন চাররাত মুষলধারে বিষ্টি! অ্যাঁ। প্রলয় হতে তবে আর কতক্ষণ? আর পাঁচটা দিন এভাবে চললেই তো হয়ে গেল। পৃথিবীর বারটা বেজে গেল! তার মানে মানুষের দৌরাত্মিতে অকাল প্রলয়! হবে না? ভগবানের রাজ্যে যা খুশি করলেই হল? বলি এত জল আসছে কোথা থেকে?

তা কথাটা সত্যি! 'এত জলই' বটে! ঐতিহাসিক ব্যাপার।

যেদিকে তাকাও জল, আর জল। খবরের কাগজে জলজল করছে শুধু জল, টি ভি-র পর্দায় জল, রেডিওতে জলকল্লোল।....

শিবাজী আর ফুলটুসি, বিশেষ একটি 'শব্দ সঙ্কেতে'র আশায় পাশের ফ্ল্যাটের দেয়ালের দিকে উৎকর্ণ হয়ে বসে, পড়ার বই হাতে 'পড়াপড়া' অভিনয় করছিল। সহসা মেজঠাকুমার এই উদাত্ত ভাষণ!

এরা বলে, মেজঠাকুমাকে ভোটযুদ্ধের ভাষণ দিতে মাঠে নামিয়ে দিলে, মাইক ভাড়া করতে হবে না। আর ঠিক তেমনি—ধরলে কথা থামায় কে?

এখন বোধ হয় থামাবার চেষ্টাতেই ফুলটুসি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, ও মেজঠাকুমা, জল তো বুঝলাম! কিন্তু আর পাঁচটা দিন মানে কি? ও মেজঠাকুমা—

মেজঠাকুমা অগ্রাহ্য ভরে বলেন, মানেটা আবার তোদেরও ব্যাখ্যা করে বলতে হবে? এ তো নিরক্ষর চাষীবাসীরাও জানে, ন'দিন নাগাড় বিষ্টি হলেই প্রলয়!

চাষীবাসী'রা কী জানে আর না জানে, ভগবান জানেন, তবে মেজঠাকুমা সবই জানেন। কবে 'প্রলয়ের কাল' আসবে, কবে বাসুকী মাথা নাড়বেন, কবে অভাগা ভগবান বেচারিকে মানুষের উৎপাতে উৎখাত হয়ে সশরীরে পৃথিবীতে নেমে আসতে হবে, এ সবকিছুই

মেজঠাকুমার নখদর্পণে! কাজেই মেজঠাকুমা ধরে ফেলেছেন, উনিশশো চুরাশির জুন মাসের এই বেমক্কা কাণ্ডজ্ঞানহীন বৃষ্টিটি ভগবানের নিয়মকানুনের আওতাছাড়া। এর কারণ 'অন্য'।

শিবাজীর আর পড়া পড়া অভিনয় ভাল লাগছে না। বইটা মুড়ে ফেলে বলল, পৃথিবীর বারটা বেজে গেলে অবশ্য খুব খারাপ নয়। তাহলে আর পরীক্ষা দিতে হবে না। জেঠুর মিটিমিটি হাসিটি দেখতে হবে না। কিন্তু ও মেজঠাকুমা অকাল প্রলয়টা কেন?

মেজঠাকুমা নিশ্চিত প্রত্যয়ের গলায় বলেন. কেন আবার? এ সেই তোমাদের 'মহাকাশযানের' প্রতিফল। কী ঘটা, কী উল্লাস, মহা-আকাশযান 'উড়ল'। বলি 'উড়ল' মানেই তো 'ফুঁড়ল'? আকাশ খানাকে ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। তো ভগবানের জমিদারির বিলি ব্যবস্থায় যেসব মেঘেরা 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে' অনন্তকাল ধরে নট নড়ন চড়ন নট কিচ্ছু হয়ে পড়েছিল. তোদের ওই মহাযান তাদের পেটে গোঁত্তা মারতে মারতে ফুটো করে দিয়ে উঠে চলে গেল কিনা? অ্যাঁ? তবে? ফুটো হলেই জল ঝরবে। তাই ঝরছে।

শিবাজী তার একটা কানকে অবহিত রেখে বলে উঠল, ও মেজঠাকুমা, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' কেন?

কেন?

মেজঠাকুমা তাঁর নখদর্পণের ঝুলি থেকে ঝটপট জবাবটা সাপ্লাই করে ফেললেন. কেন জানিস, পৃথিবীটাকে সূয্যিঠাকুরের তেজদিষ্টি থেকে রক্ষে করতে! ঠাকুরটির তেজটি তো সোজা নয়। দুইয়ের মাঝখানে তাই ওই পেল্লায় পেল্লায় জলভরা মেঘের ছাউনির ব্যবস্থা। তা মানুষ যদি কেবলই দুর্মতির বশে ভগবানের বিলি ব্যবস্থায় গোঁত্তা মেরে বেড়ায়, তো হবেই সব এলোমেলো কান্ড। এতটুকু একটু জলভরা তালশাঁস, তাতেও খোঁচা মারলে দু পাঁচ ফোঁটা জল পড়ে। আর এ তো অফুরন্ত জলের আধার। সামান্য ওই তোদের ছাতের রিজারভারটা? দে না তার তলাটা ছ্যাঁদা করে? দেখ কী হয়? ওঃ! দাঁত বার করে হাসি হচ্ছে? হাস। হেসে নে। এরপর যখন বিলেত আমেরিকার সাহেবরা বলবে, 'হ্যাঁ তাই বটে!' আর সে কথা খবরের কাগজে ছেপে বেরবে; তখন ভক্তি করে মানবি।

হুঁ। জানতে তো আর বাকি নেই আমার। ওই তো এখন কোন সাহেব এসে বলছে আকাশের উর্দ্ধে 'দেবলোক' বলে একটা 'লোক' আছে। সেখানে দেবতাদের বাস, শীগগিরই তাঁরা মর্তে নেবে আসবেন, বিশ্বাস করছিস তো সে কথা?

দূর! কে বিশ্বাস করছে?

এখন করছিস না, ভবিষ্যতে করতে হবে। তোদের এই মেজ ঠাকুমার জানতে কিছু বাকি নেই।

নাঃ! শব্দের সঙ্কেতটা আর আসছে না। এদিকে ঘড়ির কাঁটা বোঁ বোঁ করে এগোচ্ছে। আকাশে রোদ নেই বলে কি আর দুপুর বসে থাকবে? যেই না একটু জমিয়ে বসা হবে, সেই 'খাবার সময় হয়ে গেছে' ডাক পড়বে। আর পড়লে তো এক মিনিট দেরি করার জো নেই। ডাকের ওপর ডাক যাবে, এবং আসামাত্র, সমবেত কন্ঠে ধিক্কার সঙ্গীত শুরু হয়ে যাবে, আশ্চর্য। আড্ডা পেলে আর হুঁশ থাকে না! ডিসিপ্লিন বলে কিছু নেই? ওদের বাড়িটাই বা কেমন? ইত্যাদি···

'ওদের বাড়ির' দিকে কান খাড়া রেখে শিবাজী অগত্যাই কথা চালায়, আচ্ছা মেজঠাকুমা, তুমি বাপু স্বর্গ মর্ত পাতাল, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই যদি জেনে বসে আছ তো আমাদের মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্রটা এখন থেকেই আউট করে দাও না বাবা! ভবিষ্যৎ বাণী করে ফেল, 'ওরে বৎস, এই আসবে তোদের পরীক্ষায়।' ব্যস এখন থেকেই মুখস্থ করতে থাকি।

মেজঠাকুমা ভুরু কুঁচকে বলেন, পরীক্ষা কবে?

—সে অনেক দেরি! পঁচাশি সালের মার্চে টার্চে। কিন্তু জেঠুর জ্বালায় উঃ। দেখলেই ভয় লাগে।

ফুলটুসি বলে ওঠে, আমারও। জেঠুর পায়ের শব্দ শুনলেই, বুক ধড়ফড় করে। এটা মাধ্যমিকের বছর বলে, পড়া ছাড়া আর কিছু যেন করার আইন নেই। গল্পের বই? যেন বাঘ ভালুক, ছুঁলেই হালুম করে খেয়ে নেবে আমাদের। আর—

মেজঠাকুমা ভুরু কুঁচকে বলেন, 'পড়া পড়া' করে ঘটাই তোদের মারে ধরে না কী?

—আহা। না না।

শিবাজী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, মারবেন কি? অহিংস মানুষ! নিরিমিষ খান! চুল আঁচড়ান না, সাবান মাখেন না, একঘণ্টা পুজো করেন। মারেন না। কোনদিনও না। তবে ধরেন। হ্যাঁ ধরেন। দেখলেই ধরে ফেলেন

মেজঠাকুমা সন্দেহের গলায় বলেন, ধরে মানে? ধরে কী করে? বেদম ধমক ধামক দেয় বুঝি? ধমকের চোটে পিলে চমকে দেয়?

—না, না! তাও না। শুধু ওঁর সেই পেটেণ্ট স্টাইলে না হেসেও ফাঁকে একটু ব্যঙ্গ হাসি হেসে একটু জিগ্যেস করেন।

—কী জিগ্যেস করে?

কেন! শিবু, তোর মাধ্যমিকটা যেন কোন বছরে? সামনের বছরে না তার পরের বছরে? তাই হবে মনে হচ্ছে। তা ভাল ভাল। দু বছর আগে থেকেই যে পড়ার বই একটু আধটু নাড়াচাড়া করছিস এটা কম নাকি? নয়ত বলবেন, গল্পের বই পড়ছিস? পড় পড়। গল্পের বই পড়লে মাথা খোলে। গোয়েন্দা গল্প হলে তো আরোই! আমরা বোকা বুদ্ধু ছিলাম, কেবলই বই পড়ে মরতাম?

—বলে বুঝি?

মেজঠাকুমা একটু মুচকে হাসেন।

—বলেন তো।

ফুলটুসি এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, কোথায় জেঠু?

—কোথায় আবার। ভজুবাবুর ওখানে গিয়ে দাবা খেলছে।

—এ মা! রাস্তায় এত জল!

—তাতে তো ওর ভারি পরোয়া। হাঁটুর ওপর লুঙ্গি তুলে খড়ম খটখটিয়ে চলে যায়। রোজই তো যাচ্ছে। বিষ্টি বলে মানছে?

ফুলটুসি বলে, হুঁ! আমাদের বেলাই যত দোষ। এত ইচ্ছে করছিল কাল, একটু জলে নামি, তো নামতে দিলে তো? নেহাৎ নাকি এই ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে বন্ধুরা আছে তাই বেঁচে আছি। তো সেদিন লালীদের ফ্ল্যাটে গিয়ে গল্প করছিলাম, জেঠু টের পেয়ে বললেন কিনা, আড্ডা দিবি না? দিবি বৈকি! কিছু হবে না, থার্ড ডিভিশনটা তোর মারে কে। ব্রেন যখন পরিষ্কার। কবে পরীক্ষা তার ঠিক নেই। এখন থেকেই—

হঠাৎ থেমে গেল। শব্দ! শব্দ! খট খট! কট কট! খটাখট।

মেজঠাকুমা বলে উঠলেন, কে কোথায় আবার এখন কাঠ কাটতে বসল। দেখি—

শিবাজী বলল, উঃ।

ফুলটুসি বলল, আঃ।

বলবে না? কতক্ষণ থেকে মিনিট গুনছে।

অবস্থাটি তো প্রায় গ্রাম-গঞ্জের বন্যাপীড়িত জলবন্দীদের কাছকাছি। কে বলবে জায়গাটা কলকাতা শহর, আর পাড়াটা শহরের মধ্যে রীতিমত একটি নামীদামী পাড়া! আজ চারদিন চাররাত পাড়াটাকে দেখাচ্ছে একটা জলবেষ্টিত দ্বীপের মত। আর এই শৌখিন ফ্ল্যাটওয়ালা চারতলা 'ভবনটি' যেন সমুদ্রে অর্ধমগ্ন একখানি জাহাজ।

তফাতের মধ্যে ওই গ্রাম-গঞ্জের লোকেরা নাকি খেতেটেতে পাচ্ছে না, মাঝে মাঝে আকাশ থেকে খাবার পড়ছে। আর এরা খেতেটেতে পাচ্ছে। চারবেলাই পাচ্ছে, এবং যার যার রান্নাঘর থেকেই সাপ্লাই হচ্ছে। কিন্তু সে আর এমন কি ব্যাপার? 'খাওয়াটা' তো একটা বিরক্তিকরই, অবশ্যই এই ফ্ল্যাটবাড়ির ছেলেমেয়েদের। বেশিরভাগই যারা সবেধন নীলমণি!

রাস্তায় বেরতে না পাওয়া, বাড়িতে আটকে থাকা, এর থেকে আর শাস্তি আছে? এদের দুর্ভাগ্যক্রমে এখন আবার গরমের ছুটি চলছে। স্কুল খোলা থাকলে, এমন দুর্দশা হত কিনা কে জানে।

তবে কেউ কি আর রাস্তায় নামছে না?

নামছে বৈকি।

কর্তাদের তো অফিস-টফিস যেতে হবে।

রিকশ ডাকিয়ে, কোনমতে পেন্টুল বাঁচিয়ে, রিকশয় উঠে পড়ে জল এলাকা পার হয়ে তারপর যেভাবে হোক। রিকশওলাদের ইতিহাস এখন সুবর্ণ যুগ।

কিন্তু জল ঠেলে রিকশটা ডেকে আনছে কে?

কেন ওরা! মানে কাজের লোকেরা। কোন বাড়িতে আর অন্তত একটা করে কাজের লোক না থাকে? হয় একটা ফ্রকপরা খুকী, নয় একটা হাফপেন্টুল পরা খোকা। ওই হাঁটুজলই যাদের বুকজল। তা তারা ওই একবার কেন, দশবারই যাচ্ছে জল ঠেলে

ঠেলে। বাজারে কিছু মিলছে কিনা দেখতে, কিছু না পাক, আলু পিঁয়াজ আর ডিম এনে মজুত করতে, খাবারের দোকান থেকে গরম সিঙাড়া আনতে, বাবুদের সিগারেট ফুরিয়ে গেলে সিগারেট এনে দিতে। তা সে তো করতেই হবে। ওদের কথা বাদ দাও।

ফুলটুসিকে একবারটির জন্যেও জলে পা ডোবাতে রাস্তায় নামতে দেওয়া হয়নি বলে ফুলটুসি কাল খুব রেগে গিয়ে বলেছিল, একবার নামলেই অমনি নিমোনিয়া হবে! আর সন্ধ্যা যে এতবার যাচ্ছে?

শুনে জ্যেঠু অবাক হতবাক নির্বাক হয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ ফুলটুসির মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে ছিলেন। অতঃপর বলেছেন, সন্ধ্যার সঙ্গে তুমি নিজের তুলনা করছ? নাঃ। বলার কিছু নেই।

সব সময়ই জেঠুর 'বলার কিছু থাকে না', অথচ বলেও চলেন!

বাড়িতে যাকে যা কিছ বলাবলির ভার জেঠুর ওপরই। অবশ্য মেজঠাকুমা বাদে। তিনি যখন তখনই এই ভাসুরপোটিকে নস্যাৎ করে দেন, 'তুই থামতো, তুই নিজের চরকায় তেল দিগে তো' বলে। তবে তাঁর পরেই জেঠু অর্থাৎ ঘটাই এ সংসারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

শিবাজীর বাবা পটাই (এঁদের সব ভাল ভাল নাম একটা করে আছেই। কিন্তু বাড়িতে আবার কে পোশাক পরে বেড়ায়?) ইনি সাতেও নেই পাঁচেও নেই, তবে 'একে' আছেন। সেই 'এক'টি হচ্ছে 'জ্যেঠু' সম্পর্কে তটস্থ রাখিয়ে রাখা।

অ্যাঁ! জেঠু যে কাজ পছন্দ করেন না তাই করছ? ছি ছি। হ্যাঁরে বেরচ্ছিস, জেঠুকে জিগ্যেস করেছিস? সে কি! কি আশ্চর্য তুমি জেঠুর মুখের ওপর কথা বললে? আমি যে এখনো তা ভাবতে পারি না!

কাজেই পটাইও কিছু ফ্যালনা নন।

আর ফুলটুসির বাবা ছোটাই তিনি তো আজ দিল্লী কাল বম্বে পরশু ভিজাগাপটম, তর্সু কোয়েম্বাটুর। কাজেই ফুলটুসিকে পড়ার জন্যে মা-বাপ ছেড়ে এখানে থাকতে হয়। তা ফুলটুসির মা পত্রাঘাতে যতটা যা করতে পারা সম্ভব তা করে থাকেন।

ফুলটুসি শুধু তার ক্লাসের অন্য মেয়েদের অবাধ সুখ স্বাধীনতা অনুমান করে মর্মাহত হয়। শিবাজীও তাই!

এই যে এখন!

পাশের ফ্ল্যাটে একটু ক্যারম খেলতে যাবে, তাও কত শলা-পরামর্শ!

আসলে ক্যারম খেলায় কোন উৎসাহই ছিল না এদের। ক্যারম বোর্ডের মালিক তিলকেরও না। রাস্তায় বেরতে পেলে কে আবার ঘরে বসে খেলতে চায়? কিন্তু এই চারদিনেই যে চার বছর। তিলক তার সাতপুরু ধুলো জমে থাকা বোর্ডটাকে পেড়ে মুছেটুছে খাদ্য-যোগ্য, মানে খেলাযোগ্য করে তুলেছে। ঘুঁটিগুলো কি ভ্যাগ্যিস হারায়নি।

তবে খেলা জিনিসটার এমনই মজার যত অবহেলিত অবজ্ঞারই হোক, খেললেই নেশা। এই যে সেবার পুজোর ছুটিতে 'ছোটাই' এসেছেন, দেখলেন শিবাজীর খুদে বোনটা সন্ধ্যার সঙ্গে লুডো খেলছে। তো কিছুতেই আর ওই বেচারি সন্ধ্যার ছয় পড়ছে না।

ছোটাই বললেন, দে, আমি তোর 'ছয়' ফেলে দিচ্ছি।

ব্যস! সেই যে দিলেন, আর ছক ছাড়লেন না। সন্ধ্যার মঞ্চ ছেকে বিদায়। আর তারপর মানবিকতার বশে ছোটাই ওদের একটা নতুন লুডোর ছক কিনে দিয়ে, এই পয়মন্ত ছকটি নিয়ে অহরহ খেলে চললেন। খাবার আগে, খাবার পরে। ঘুমের আগে, জাগার পরে।

কার সঙ্গে?

কেন বড়দার সঙ্গে। বড়দা ঘটাইয়ের তো অগাধ অবসর। রিটায়ার্ড মানুষ।

শিবাজী তিলকেরও ওই ধুলো ঝেড়ে নেওয়া পালিশ ঘষা ক্যারম বোর্ডেরও এই কদিনেই নেশা লেগে গেছে।

তিলকের বলা আছে বাবা অফিসে বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই তোকে সাঙ্কেতিক শব্দ করে জানাব বোর্ড পেড়েছি। সেই সাঙ্কেতিকটি কী? আর কিছুই না, খালি বোর্ডে কটাকট খটাখট স্ট্রাইকার পেটা। যা শুনলে কাঠ কাটার শব্দ বলে ভ্রম হয়।

—আজ এত দেরি যে?

শিবাজীর প্রশ্নে, তিলক তাড়াতাড়ি ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে আস্তে কথায় ইশারা করে বলল, আর বলিস না! বাবা বেরবার আগেই বুড়োমামা এসে হাজির।

—বুড়োমামা! তিনি আবার কে? তোর তো একজন মাত্রই মামা জানি।

—সে তো আদি ও অকৃত্রিম! কিন্তু সবাইয়ের কথা কি জানা? বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম মামারা নেই?

—কৃত্রিম মামা!

ফুলটুসি প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে, কৃত্রিম মামা! সেটা আবার কি জিনিস?

—জিনিস নয় হে, মানুষ! কেন তুতো মামা? অকৃত্রিমের বিররীত। বুড়োমামা হচ্ছে আমাদের তেমনি এক তুতো মামা। তিলক চোখ কুঁচকে বলল, এবং ডেঞ্জারাস মামা।

—ডেঞ্জারাস মামা!

শিবাজী বলে ওঠে, মামা আবার কতটা ডেঞ্জারাস হতে পারে রে? তাও আবার তুতো! এই সংসারে সব থেকে ডেঞ্জারাস প্রাণী কে জানিস?

—কে?

সবচেয়ে ডেঞ্জারাস প্রাণী হচ্ছে ব্যাচিলার জ্যাঠামশাই। বুঝলি? আইবুড়ো জেঠু!

এই।—তিলক বলে, বুড়োমামার ব্যাপারটা—

....আরে বাবা যে ব্যাপারই হোক—

শিবাজী ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে—যে ব্যাপারই হোক মামা আর কতই পারে? অন্য বাড়ির লোক! তাও তুতোমামা! আরো দূর বাড়ির! বড়জোর আজকালকার ছেলেমেয়েদের মুণ্ডুপাত করতে করতে তুলো ধোনা করে ছাড়তে পারে।

তিলক অবাক হয়ে বলে 'কী' করতে পারে?

ফুলটুসি হিহি করে বলে, তুলো ধোনা জানিস না? হিহি, তা না জানতেও পারিস। মেজঠাকুরমার পাঠশালায় তো মানুষ হোসনি। 'তুলো ধোনা' মানে হচ্ছে যাকে ধরব, তার আর 'কিচ্ছু' রাখবে না। ধুনুরিরা যেমন তুলোগুলোকে ধাঁইধপাধপ পিটিয়ে

তাদের বাতাসে উড়িয়ে দেয় প্রায় তেমনি আর কি! পিটুনিটা লাঠিতে না হয়ে কথাতে এই যা! তা মামা মেসো পিসেদের কাজই তো এই। আমার বড়মামা তো বাড়ি ঢুকেই বলে উঠবেন, 'আজকালকার ছেলেমেয়েদের কথা আর বলিস না—...ওঃ! যা হচ্ছেন সব।' বলেই সেই তাদের কথাই বলতে শুরু করবেন। থামবেন না। মানে যতক্ষণ না মুখ চালাবার জন্য ব্যবস্থা করে মুখটি বন্ধ করা হবে ততক্ষণ চালিয়ে যাবেন—এইসব 'আজকালেরা' কত অ-সভ্য, কত অবাধ্য, কত উদ্ধত, অবিনয়ী, সৌজন্য-বোধহীন; কত আত্মকেন্দ্রিক, অলস, কর্মবিমুখ। তাদের মধ্যে কত অ্যাডজাস্টমেণ্টের অভাব। ধৈর্য সহ্যের অভাব লক্ষ্মীছাড়াদের গুরুলঘুর জ্ঞান নেই, মায়া নেই, মমতা নেই, ভালবাসা নেই, দায়িত্বজ্ঞান কিছু নেই। থাকার মধ্যে আছে রাগ, তেজ, মেজাজ, জেদ—ফ্যাসান অহঙ্কার—

ঘরের কোণে জানলার ধারের সোফাটায় বসে তিলকের পিঠোপিঠি দিদি ঝিলম একটা গল্পের বই পড়ছিল, মুড়ে রেখে বলল, নাঃ, বইটা আর তোরা শেষ করতে দিলি না। শেষ হয়ে আসছিল। তো হ্যাঁরে ফুলটুসি তোর বড়মামা একা এত কথা বলেন? জলে স্থলে আকাশে বাতাসে অবশ্য সারাক্ষণ সমবেত কণ্ঠে এই সবই শোনা যায়, কিন্তু এক—

ফুলটুসি বলে ওঠে, ও ঝিলমদি, এ তো শতাংশেরও একাংশও নয়। স্টক অফুরন্ত।

—তা তুইও তো খুব মুখস্থ করতে পারিস বাবা! যা গড়গড়িয়ে বলে গেলি। হি হি, তুই হিস্ট্রিতে অনার্স নিস।

শিবাজী বলে ওঠে, আর 'ইংলিশ মিডিয়মে'র সমালোচনা করেন না?

ফুলটুসি বলে ওঠে, ও বাবা, তা আবার নয়? বলব কি সে প্রসঙ্গ উঠলে, দাদু শুদ্ধু রণক্ষেত্রে নেমে পড়েন। দেশের এই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর ফলেই যে দেশ উচ্ছন্নে যেতে বসেছে, ছেলেমেয়েরা সব অমনিষ্যি হয়ে যাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই! শিক্ষা-দীক্ষা হচ্ছে কচুপোড়া, কেবল ফ্যাসান শেখার কারখানা। এর থেকে ঢের ভাল ছিল গ্রামের পাঠশালাগুলো। তাতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাল

ভাল সব গুণের বিকাশ হত। আর এই ইংলিশ মিডিয়াম? যত নষ্টের গোড়া।

শিবাজী নিঃশ্বাস ফেলে বলে, সে যে যা বলে বলুক, জেঠুর কাছে কেউ লাগে না। চিরকাল জেলখানার আসামী হয়ে আছি। ওনার দৃষ্টির আড়ালে একটি নিঃশ্বাস ফেলারও উপায় নেই। তোদের 'ফ্রিনেস' দেখলে হিংসে হয়।

হঠাৎ তিলকও একটু অদ্ভুত বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল, হায়! কে কার বিষয় কতটুকু জানে?

ঝিলম বলল, এই বুড়োমামা বোধ হয় চানের ঘর থেকে বেরোল।

ফুলটুসি তাড়াতাতি বলল, এই ঝিলমদি, বুড়োমামা কেন ডেঞ্জারাস সেটা তো বললে না?

ঝিলাম একটু চাপা হাসি হেসে বলল, সাংঘাতিক হাত দেখতে পারে। দারুণ, দুর্দান্ত!

—হাত দেখতে পারেন! অ্যাঁ!

শিবাজী ফুলটুসি সমস্বরে বলে ওঠে, অ্যাঁ। এটা বুঝি খারাপ হল?

—একটু হল বৈকি। শুধু তো ভূত ভবিষ্যতই বলতে পারেন না। হাত দেখে স্বভাব প্রকৃতি বলে দিতে পারেন যে। ছোটপিসি বুড়োমামার কাছে হাত দেখানর পর থেকে রাগ করে আর এ বাড়ি আসে না।

—ওমা! কেন?

বুঝতে পারছিস না? বুড়োমামা বলে দিয়েছিল মহিলাটি ঝগড়ুটে, রাগী, হাড়কেপ্পন, আর বদমেজাজি! ব্যস। হয়ে গেল। কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেছল কিনা!

ফুলটুসি বলল, তা হোক গে! আমরা তো আর তেমন নয় বাবা! আমরা হাত দেখাব। কী মজা! কী মজা! ও তিলক, কখন দেখা হবে বুড়োমামার সঙ্গে?

পেছন থেকে দৈববাণীর মত অকস্মাৎ উচ্চারিত হল, হবে! হবে। আগে পেটে কিছু ভালমন্দ মাল চালান করে নিই। যার জন্যে আসা!

যার জন্যে আসা। হ্যাঁ তাই তো! আমহার্স্ট স্ট্রিটের যে মেসটিতে থাকেন উনি, তার রান্নাঘরে রাস্তার জল উপচে ঢুকে পড়ায় মেস ম্যানেজার সবাইকে নোটিশ দিয়ে দিয়েছেন, যতদিন না জল নামছে, ততদিনের মত কেটে পড়।

তো কোথায় আর কেটে পড়তে যাবেন বুড়োমামা, এমন একটি ভক্তিমতী তুতো বোন থাকতে? তাদেরও রাস্তায় জল? তাতে কি? ফ্ল্যাট তো তিনতলায়। আর রান্নাঘরে? শত অসুবিধেতেও অন্নপূর্ণা বিরাজিতা।

ঘটাই খড়ম খটখটিয়ে বাড়িতে ঢুকেই, এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, বাবুদের টিকি দেখছি না যে বৌমা?

ফুলটুসিকেও উনি বাবুই বলেন। ছেলেদের সঙ্গে একই ইস্কুলে পড়ে যখন।

'বৌমা' অর্থে শিবাজীর মা। ঘটাইয়ের ভাদ্রবধূ! বেচারি, ইতিমধ্যে বারতিনেক পাশের ফ্ল্যাটে দূত প্রেরণ করেছে। কিন্তু বাবুদের আনাতে পারেনি। প্রত্যেকবারই জানতে চেয়েছে জেঠু ফিরেছেন কিনা, এবং উত্তর শুনে আশ্বস্ত হয়ে বলেছে, যা, একটু পরে যাচ্ছি।

বেচারি 'বৌমা' এইমাত্র ভাবছিল, নিজেই একবার গিয়ে হিঁচড়ে 'টেনে আনি', সেই মহামুহূর্তে দণ্ডমুণ্ডের কর্তার আবির্ভাব। অর্থাৎ তার হৃৎকম্প!

অতএব সে মিনমিন করে যা বলল, তা ঘটাইয়ের ঠিক বোধগম্য হল না। ডাক দিলেন, মেজখুড়ি! এরা কোথায়?

মেজখুড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, ওমা এখনো আসেনি বুঝি? সন্ধ্যা যে ডাকতে গেল। আসবে কি। মস্তো আকর্ষণে পড়ে গেছে! তিলকের এক মামা না কে এসেছে। না কি হাত দেখতে জানে। তাই দেখাদেখি চলছে!

ঘটাই স্তম্ভিত গলায় বলেন, 'তাই চলছে।' আর তুমি সেটি আহ্লাদ করে বলছ? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেছ?

মেজখুড়ি অবহেলায় বলেন, তা তুইও তো এই এতখানি বেলায় দাবা চেলে বাড়ি এলি!

—অ্যাঁ! আমি! আমি দাবা চেলে—

ঘটাই কিছুক্ষণ তাঁর খুড়ির মুখের দিকে অবাক, হতবাক, হয়ে তাকিয়ে থেকে বলেন, 'আমার সঙ্গে ওদের তুলনা করছ তুমি?'

—তা করব না কেন?

মেজখুড়ির দৃপ্ত ঘোষণা, তুই একটা বুড়োধাড়ি, খেলায় বসে হুঁস থাকে না। আর ওরা ছেলেমানুষ!

একটা মজার ব্যাপার পেয়েছে—

—চমৎকার! এই তোমার প্রশ্রয়ে প্রশ্রয়েই বারটা বেজে যাবে ওদের মেজখুড়ি। এক একটি হনুমান তৈরি হবে!

মেজখুড়ি অম্লান মুখে বলেন, ওটাই তাহলে তোদের মেজ-খুড়ির হাতের গুণ! তোরাও তো আমার হাতেই তৈরি। যা দিকিন, রাস্তার জমা জলের পা দুটো ভাল করে ধুয়ে আয়! নর্দমার জলে একাকার! খুব রেগে গিয়ে পা ধুতে চলে যান ঘটাই।

আর? আর—

ফিরে এসে দেখেন, মেজখুড়ি নাতিনাতনীদের কাছে দাঁড়িয়ে মহোৎসাহে বলছেন, তাই না কি? তবে তো বাবু একবার বলে কয়ে ডেকে আনতে হয় তাকে! হাতটা একবার দেখিয়ে নিই, কবে মরব!

ঘটাই এই দৃশ্যের ওপর আর কি শাসন চালাবেন? যথারীতি না হেসেও গোঁফের ফাঁকে হেসে বলে ওঠেন, তুমি আবার একটা বুজরুকের কাছে হাত দেখাতে যাবে কি মেজখুড়ি? তুমি তো সর্বজ্ঞ!

মেজখুড়ি অবশ্য হারেন না। অবহেলায় বলেন, ওরে ঘটাই, সত্যি সর্বজ্ঞরাও নিজের মরণ তারিখ বলতে পারে না। আর না দেখেই বুজরুক বলছিস যে?

বুড়োমামা বললেন, আপনার হাত অতি উত্তম হাত মাসিমা। সম্রাজ্ঞী যোগ। পূর্ণ আয়ুর হাত! অর্থাৎ একশ বছর আপনার মারে কে?

মেজঠাকুমা রেগে বললেন, একশ বছর! এই কথাটি শোনাবে বলে, তোমার জন্যে আমি গোকুলপিঠে, পাটিসাপটা বানিয়ে রাখলাম?

—অ্যাঁ, গোকুলপিঠে! পাটিসাপটা! আহা! কতকাল এসব বস্তুর নামও শুনিনি। মা মারা গিয়ে অবধি—ঠিক আছে আপনার যখন একশয় এত আপত্তি, গোটা দশেক বছর না হয় ম্যানেজ করে নিচ্ছি।

—মাত্তর গোটা দশেক! ওতে আর কী হবে?........বৌমা মাছের কচুরি কখানা ভেজে ফেলে তুমিও একবার হাতটা দেখিয়ে নাও তো। হাতের কাছে একজন হাত-দেখিয়ে পাওয়া গিয়েছে যখন।

তারপর অনুনয়ের স্বরে বলেন, অন্তত আর পাঁচটা বছর হয় না বাবা?

—বলছেন? দেখি তাহলে।

বুড়োমামা নাক টেনে বলেন, আপনার বৌমার রান্নার হাতটি তো ভালই মনে হচ্ছে! বুঝতেই পাচ্ছি হাতের রেখাও উত্তমই হবে!

মেজঠাকুমা এবার ঘটাইয়ের দিকে তাকালেন। যেন বাড়িতে টিকে দিতে এসেছে। সবাই একটা করে নিয়ে নিক হাতটা বাড়িয়ে।

—তুইও দেখিয়ে নে ঘটাই হাতটা। পটাই তো বাড়ি নেই!

ঘটাই হাঁ হাঁ করে উঠলেন। বললেন আমি ওসব বিশ্বাস-ফিশ্বাস করি না। আমার দরকার নেই। যাদের দেখা দরকার দেখুন। ওই যে মূর্তিমানেরা দাঁড়িয়ে আছেন।

ওদের? ওদের তো বলেই দিয়েছি। স্রেফ গাড্ডু। আশ্চর্য দুজনের একদম এক।

গাড্ডু কেন?

জেঠু [illegible] খ্যাঁক করে হেসে বলেন, সে আর আপনি হাত গুনে নতুন [illegible] করবেন? সে কথা আমি ওদের জন্মের আগে থেকেই জানি।

বুড়োমামা বহুকাল চোখে না দেখা খাবারের রেকাবিটি আর মাছের কচুরির প্লেটটি টেনে নিয়ে বলেন, তবে কি না একথাও বলে দিয়েছি, মনের বল আর চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। সেই যে ইতিহাসে না পুরাণে কোথায় যেন আছে জানেন নিশ্চয়ই, বিখ্যাত

পণ্ডিত পাণিনি? তো পাণিনির হাতে না কি 'বিদ্যের রেখা' বলে কিছু ছিল না। হাতের চেটো ল্যাপা পোছা। কিন্তু জেদ চাপল বিদ্যাস্থানে রেখা বানিয়ে ছাড়বেন। ব্যস যে কথা, সেই কাজ. একটু শামুকের খোলা নিয়ে হাতের চেটোর এদিক থেকে ওদিক ফালা দিয়ে রেখা বানালেন। তারপর তো কে না জানে? অদ্যাবধি পাণিনির নাম টিকে আছে। তাই বলেছি চাই চেষ্টা আর—আহা মাসিমা, কী জিনিসই খাওয়ালেন! বহুকাল পরে এমন—আর বৌমা, আপনার মাছের কচুরিও দি গ্র্যাণ্ড। ফার্স্ট ক্লাস। আহা আপনার ছেলেটি যদি এই কোয়ালিটির হত। আর দুখানা যদি বাড়তি থাকে—

চেটেপুটে খেয়ে-দেয়ে চলে গেলেন।

কিন্তু তার বিনিময়ে?

তার বিনিময়ে ঠিক যাত্রাকালে স্নেহময়ী মাসিমার বুকের মধ্যে একটি ছুরি বিঁধিয়ে দিয়ে গেলেন।

বুড়োমামা মেসে ফিরে গেছেন, আকাশ রোদে ফাটছে। বোঝা যাচ্ছে ভগবানের জমিদারির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই ঠিকই আছে। এখন আবার না খরা হয়. সেই ভাবনা।

কিন্তু?

কিন্তু বুড়োমামার 'মহাজ্ঞানযান' একখানি গোঁত্তা মেরে জেঠুর বাড়ির এই ছেলেমেয়ে দুটোর বুদ্ধির ঘটে যে ফুটোটি করে দিয়ে গেলেন সেটির কী হয়?

ওরা বলেছে, হাতের রেখায় যখন গাড্ডু খাওয়াটাই অবধারিত তখন আর মিছিমিছি খেটে লাভ কী? আয় আমরা যত ইচ্ছে গল্পের বই পড়ি যত ইচ্ছে আড্ডা দিই, যত ইচ্ছে খেলি।

এখন গরমের ছুটি ফুরিয়েছে। সবাই স্কুলে এসে জুটেছে। একই স্কুলে একই ক্লাসেরই তো ওরা। শিবাজী ফুলটুসি তিলক। তিলক বলে ঠিক আছে। আমিও তোদের সঙ্গে আছি।

শিবাজী রেগে বলে, ইয়ার্কি মারা হচ্ছে? তোকে ফেল করানোর সাধ্যি তো ইউনিভার্সিটির ঠাকুর্দারও নেই।

—আর যদি কোশ্চেন পেপার ছিঁড়ে ফেলে সাদা কাগজ রেখে চলে আসি?

—দেখ বাজে গুল মারিসনে। আমরা হলাম মোস্ট অর্ডিনারি, আমাদের কথা বাদ দে। তুই বাবা চিরকালের ফার্স্ট বয়।

তিলক দুঃখিতভাবে বলে, ফার্স্ট বয় কি সাধে হতে হয়েছে রে শিবাজী! বাবার 'অ্যামবিসন'! তাঁর ছেলেকে ফার্স্ট বয় হতেই হবে। আর মাধ্যমিকে যতগুলো সম্ভব লেটার আর স্টার পেতে হবে। ফার্স্ট সেকেণ্ড হলে তো কথাই নেই। কাজেই আমার ভাগ্যে সারাজীবন 'হ্যাট হ্যাট ঘোড়া হ্যাট'! মাঝে মাঝে এত বেজার লাগে, ইচ্ছে হয় নিই একবার এই অত্যাচারের শোধ। ফেলই করি! দেখি কি করে বাবা!

—এই ধ্যেৎ!

মেজঠাকুমার পাঠশালার পড়ুয়া পাকা কথা জানা ফুলটুসি বলে—চোখের ওপর রাগ করে তুই মাটিতে ভাত খাবি?

তিলক বলে, এক এক সময় তাই ইচ্ছে হয় রে। আচ্ছা দৈবক্রমে দিদি না হয় ফার্স্ট হবার জন্যেই জন্মেছে, কখনো চুড়োয় ছাড়া নিচের হয়নি দিদি, তাই বলে আমাকেও তাই হতে হবে? জানিস ছোটবেলায় একবার বাবাকে বলেছিলাম, দিদি 'ভাল মেয়ে' বাবা বলল, মন দিয়ে খাটলে তুমিও ভাল ছেলে হবে'! আমি বলে ফেলেছিলাম তুমি রোজ এক বাক্স করে সাবান মাখলে মার মতন ফর্সা হবে? বাবা রাগ করে সাত দিন কথা বলেনি আমার সঙ্গে। আর সেদিন বলে ফেলেছিলাম, আচ্ছা বাবা, তোমাদের কালে সব্বাই ফার্স্ট হত? সাধারণ ছেলে বলে কিছু ছিল না? বাবা রাগ করে ভাত না খেয়ে অফিস চলে গিয়েছিল। এই অবিচারের শোধ নিতে ইচ্ছে করে না? বল। তোমার সাধ তোমার ছেলে ফার্স্ট হোক। কিন্তু সেই সাধটি বাবা মেটাতে হয় কাকে বল? গা জ্বালা করে এক এক সময়।

তা বলে তুই যেন সত্যিই গায়েব ঝাল মেটাতে ওই সব যা তা করিস না তিলক!

ফুলটুসি পাকা গিন্নীর মত বলে, বাবা মা তো ভালর জন্যেই বলেন! আর তুই তো রাগ করে যাই বলিস সত্যিই ভাল ছেলে। আমাদের মত তো না। আমার মাও কি বলে না ওসব? সামনে পায় না, চিঠিতে লেখে, তোমার ওপরই তাঁর জীবন-মরণ নির্ভর

করছে। আমি রেজাল্ট খারাপ করলে—মাকে গলায় দড়ি দিতে হবে, বিষ খেতে হবে, গঙ্গায় ডুবে মরতে হবে।

হঠাৎ হি হি করে হেসে ওঠে ফুলটুসি। আমি না, হি হি, একবার লিখেছিলাম মামণি গো—কোনটার পর কোনটা করলে তিনটেই করে ওঠা যায়? তাতে না হি হি মার বদলে বাবার এক লম্বা চিঠি, মাকে এইভাবে হৃদয়হীনের মত চিঠি দিয়েছ তুমি! কত দুঃখেই না একটিমাত্র সন্তানকে দূরে রাখতে হয়েছে আমাদের।···এই সব। একমাত্র সন্তান হওয়া যে কী জ্বালা রে। দশজনের মত খেতে পারলে ভাল হয়, দশজনের মত জামা জুতো পরতে পারলে ভাল হয়, দশজনের মত পড়তে পারলে ভাল হয়। কিন্তু এখন আর উপায় কি? হাতে যা লেখা আছে, তাছাড়া তো কিছু হবে না? কি যে করে গেল তোর বুড়োমামা? একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে গেল! সত্যিই ডেঞ্জারাস!

কিন্তু সেই হাস্যবদন বড়োমামা কি শুধু এই ছেলেমেয়ে দুটোকে ডুবিয়ে দিয়ে গেছেন? বেচারি মেজঠাকুমাকে? একেবারে যাত্রাকালে হঠাৎ একখানা ছুরি বসিয়ে দিয়ে যাননি কি?

হ্যাঁ একেবারে যাত্রাকালে বুড়োমামা, ফস করে ঘটাইয়ের হাতটা টেনে ধরেই চোখ বুলিয়ে চমকে শিউরে মাথায় হাত দিয়ে বলে উঠেছিলেন, কী সর্বনাশ! এ যে খুনীর হাত!

খুনীর হাত!

ঘটাই হাত টেনে নিয়ে বলেছিলেন, বুজরুকির আর জায়গা পাননি?

বুড়োমামা বলে গিয়েছিলেন, ভগবান করুন যেন বুজরুকিই হয়। তবে এ হাত খুনীর না হয়ে যায় না।

তাহলে? ছুরি ছাড়া আর কী?

ছেলেমেয়ে দুটোর হাত 'গাড্ডুমার্কা', আর তাদের জেঠুর হাত 'খুনীর'! যোগফল? দুইয়ে দুইয়ে কী হয়, চার ছাড়া?

দিনেরাতে খাওয়া ঘুচেছে, ঘুম ঘুচেছে মেজঠাকুমার। ভেবে ভেবে এখন শেষ ভরসা ধরেছেন সেই জিনিসটি? সেই একটা জোগাড় করতে পারলে সমস্যার সমাধান।

কিন্তু কে জোগাড় করে এনে দেবে সেই দুর্লভ বস্তুটি? কে

ব্যাপারটা চাউর করে না বসে গোপন রাখবে? হাতের কাছে তো মাত্র ওই সন্ধ্যা! ফ্রক পরা খুকীটি।

তা কাঠবিড়ালীতেও সাগর বাঁধে!

ফ্রকের মধ্যে লুকিয়ে কাগজ মুড়ে নিয়ে এসে সন্ধ্যা একমুখ হেসে বলল, পেয়েছি ঠাকুমা।

—পেয়েছিস? অ্যাঁ। কই দেখি? আয় এদিকে চলে আয়। বলিসনি তো কাউকে?

—ইস! আমি তেমনি না কি?

—চল তোকে ঠাকুরের পেসাদ সন্দেশ চন্দরপুলি দিই গে। হ্যাঁরে তো ওই টাকাতেই হল?

—হল ঠাকুমা! কী আশ্চর্যি ঠিক ঠিকটি হল। তোমার কথা মতন সেই শাকউলিকে তো বলে রেখেছিলুম। ঠাকুমা বলেছে, 'এনে দিতে পারলে দামের জন্যে আটকাবে না।' তা আজ যখন জিনিসটা দিয়ে শুধল কত এনেছ? আমি তোমার দশ টাকার নোটখানা দিয়ে বললুম, এই এনেছি, এতে হবে? তো বুড়ি বলল, ঠিক কাঁটায় কাঁটায় হয়েছে গো!

মেজঠাকুমা দু হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলেন, হতেই হবে! ভগবানের নাম করে পাঠিয়েছি।

তা জিনিস তো জোগাড় হল, কিন্তু কাজে লাগানটা কীভাবে ঘটিয়ে তোলা যায়।

তা চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই। তুললেন একদিন খপ করে।

· এই তোরা আর বই খাতা ছুঁচ্ছিস না কেন রে?

—ছুঁয়ে কী হবে? পরিণাম তো জানাই হয়ে গেছে।

মেজঠাকুমা রেগে বললেন, অমনি জানা হয়ে গেছে। কাগে কান নিয়ে গেছে তো কানে হাতটা না দিয়েই কাগের পেছনে ছুটতে হবে?

—এ মা। তুমি বুড়োমামাকে কাগ বললে?

ফুলটুসি বলল, জান, ঝিলমদি বলেছে, বুড়োমামার কথা অকাট্য!

—যাক! অভীষ্ট সিদ্ধি। এখন মেজঠাকুমা অনায়াসেই বলে উঠতে পারেন, এতই যদি অকাট্য, তো সেটাই বা করছিস না কেন?

—কোনটা ?

—কেন, সেই শামুকের খোলা ?

—শামুকের খোলা ? সেটা আবার কী জিনিস ?

রেগে গেলেন মেজঠাকুমা. কী জিনিস জান না ? বলে যায়নি তোদের গণৎকার ? ওই দিয়ে হাতের চেটোয় একটা ফালা দিতে পারলেই হয়ে গেল !

শিবাজী বলল, তুমি এসব বিশ্বাস কর মেজঠাকুমা ?

ঠাকুমা ক্রুদ্ধ হল. করব না ? কেন করব না ? যদি 'গাড্ডু' বিশ্বাস করতে হয় তো, ওই মানিনীকেও বিশ্বাস করতে হবে !

মানিনী নয় মেজঠাকুমা পাণিনি।

তা সে একই কথা। তো বিশ্বাস করলে তো করলে। অবিশ্বাস করলে তো করলে। দু নৌকোয় পা কেন ?

শিবাজী বিরত মুখে বলে. তো শামুকের খোলা পাব কোথায় শুনি ?

মেজঠাকুমা এক গাল হেসে বলেন, ওমা। অভাব কী? বাড়িতেই তো রয়েছে।

—বাড়িতে ? কোথা থেকে এল ?

নাতিনাতনী অবাক !

ঠাকুমা আরো এক গাল হেসে বলেন. গেরস্থবাড়িতে সব রাখতে হয় রে ! সমুদ্দুরের ফেনা. সাগরের ঝিনুক, কুমিরের তেল, বাঘের নোখ, পুরনো ঘি, শাঁখের গুঁড়ো, তুলসীতলার মাটি। কী নয় ? একখানা শামুকের খোলা আবার বেশি কি ? তবে ওষুধ শুধু জোগাড় করলেই তো হয় না, সেবন করতে হয়। ওই তোদের পাণিনি কি আর শুধুই হাতে ফালা দিতে বসে থেকেছিল ? পুঁথি-পত্তর নাড়েনি ? সেইটি বুঝে কাজ করতে হয়, এটা মানবি তো ?

ঘটাই খবরের কাগজ পড়ছিলেন, দেখলেন, দুটো ছেলেমেয়ে সুড়ুৎ করে বারান্দার দিকে চলে গেল। তা গেলেই তো আর তিনি ছাড়বেন না। 'মারেন না' বটে, তবে ধরেন তো ? ধরলেন।

অ্যাই দুজনের হাতের তেলোয় ব্যাণ্ডেজ কেন রে ? এটাই বুঝি তোদের ইস্কুলের লেটেস্ট ফ্যাসান ?

ফুলটুসি ঝঙ্কার দিল, আহা ফ্যাসান আবার কী ?

—তাহলে বোধহয় বুড়োধাড়ি দুটোতে আঁচড়া-আঁচড়ি করেছিস !

ফুলটুসি ফিক করে হেসে ফেলে বলে, আহা আমরা বুঝি বেড়াল ?

—তবে ব্যাণ্ডেজ কিসের ?

—এমনি।

—এমনি ! এমনি হাতে একটা ব্যাণ্ডেজ ! বল কেন ?

মেজঠাকুমা শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, সবসময় টিকটিক করিস কেন বল তো ? ও আমার মানত।

বলবেন না ? ওর হাতটা খুনীর না ? রেগে গেলে কী হয় আর না হয়।

—মানত ! হাতে ব্যাণ্ডেজ মানত ! আমি ঘাস খাই ? এই তোমার প্রশ্রয়েই গোল্লায় গেল।

মেজঠাকুমা বললেন, ওই তো দশা আমার। না হলে আর তুই এই নির্ধিটি হোস !

—উঃ। বুড়ো মানুষরা তো তীর্থও যায় !

ঘটাই ভাবলেন, এদের এই মাধ্যমিকের বছরটাও যদি মেজখুড়ি কাশীবাস করতে যেতেন !

অবশ্য বসে বসেই মেজখুড়ির 'বন্ধ রান্নাঘরে'র কাল্পনিক দৃশ্যটা চোখ ভেসে উঠল। ঘটাইয়ের নিরিমিষ খাওয়ার পাতে কে জোগান দেবে, মোচার ঘণ্ট, শাকের ঘণ্ট. পোস্তর বড়া. ধোঁকার ডালনা, কচুর শাক. সজনেডাঁটার চচ্চড়ি, ডুমুরের চপ।

তা একটু না হয় কৃচ্ছ্রসাধনই করতেন ঘটাই, তবু ছেলে-মেয়ে দুটোকে বাগে পেতেন। ছোটাই মেয়েটাকে তার জেঠুর ভরসাতেই তো কলকাতায় রেখে দিয়েছে সব বিষয়ে চৌকস করতে। কিন্তু বাগড়া দিতে তো ওই মেজখুড়িটি রয়েছেন। থাকবেনও। এখন আর ভুলিয়ে-ভালিয়েও কাশী পাঠান যাবে না। কারণ সামনের পুজোয় ছোটাইরা আসছে। পুজোর পরই তো ফুলটুসির প্রি-টেস্ট। এবার আর ও মা-বাপের কাছে যাবে না। ওরাই আসবে।

দেখতে দেখতেই দিন যায়। পুজোও এল। ছোটাই আর ছোটাই গিন্নীও এলেন। আর আসামাত্রই তিনি শিউরে উঠলেন।

ফুলটুসি ! তুমি নাকি নাচের ক্লাস ছেড়ে দিয়েছ ?

শিবাজীর খুদে বোনটা বলে উঠল, কবে। আমাকে রোজ রোজ একা যেতে হয়।

—আশ্চর্য, ছেড়ে দিলে কী বলে ? জান, নাচ একটা যোগ ব্যায়াম ! হঠাৎ ছেড়ে দিলে ফিগার খারাপ হয়ে যায়।

—নাচতে আমায় ভাল্‌লাগে না।

—ভাল লাগে না ?

ফুলটুসির মা আকাশ থেকে পড়লেন, এতবড় একটা পৃথিবী-ব্যাপী শিল্প। আমার তো এখনো নাচ শিখতে ইচ্ছে করে। জীবনে তো সুযোগ পাইনি।

ফুলটুসি মার এখনো ইচ্ছে করে শুনে মার ফিগারের দিকে তাকিয়ে কষ্টে হাসি চাপে।

—তা গানের ক্লাসগুলো করছ তো নিয়মিত ?

....বাঃ। কখন সময় হয় ? জেঠু কেবল পড়াপড়া করেন !

ফুলটুসির মা বসে পড়লেন।

—নাচ ছেড়ে দিয়েছ। গানের ক্লাসের সময় পাওনা ! লোকের কাছে আমি মুখ দেখাব কী করে ফুলটুসি ? ভেবে যে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। সবাই জানে আমার মেয়েকে আমি কলকাতায় ফেলে রেখে দিয়েছি 'তৈরি' করার জন্যে। কী তৈরি হচ্ছ তাহলে ? তাই কি মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করে আমার মুখ রাখবে ?

ফুলটুসি বলল, একজামিনারদের কি তোমার মুখ রাখবার চিন্তা আছে মা ? তাই দেবে চারটি বেশি নম্বর ?

ফুলটুসির মা এলিয়ে পড়ে বলেন, তার মানে সুইসাইড করা ছাড়া আমার আর কোনো গতি নেই।

তারপর উঠে, চান-টান করে চা খেয়ে ব্যাগের পেটটি মোটা করে টাকা ভরে নিয়ে দিদির সঙ্গে পুজোর বাজার করতে বেরিয়ে গেলেন। 'দিদি' অর্থাৎ শিবাজীর মা। নিজের বাজারটাও স্থগিত রেখেছিলেন, এখন মহোৎসাহে চলতে লাগল সেই পর্ব।

ফুলটুসি বলে, মা কলকাতার বাজারে যত শাড়ি আছে, সব নিয়ে যাবে ?

মা রেগেই লাল।

সব ? একটা দোকানের একটু কোণও শেষ করতে পেরেছি ? আমার ওই হতবিচ্ছিরী দেশটায় পাওয়া যায় এসব শাড়ি ? তবে তুমি যদি রেজাল্ট খারাপ কর, এ সবই পড়ে থাকবে, আমার আর পরা হবে না

এই দায়িত্ব ফুলটুসির।

পুজোর বাজার পর্ব শেষ হল। শেষ হল পুজো পর্ব. বিজয়া পর্ব। ছোটাইরা ফিরে গেলেন তাদের সেই হতবিচ্ছিরী দেশে, প্রি-টেস্ট মিটল, টেস্ট মিটল, অতঃপর সেই ভয়ংকর দিনও এসে গেল।

তিলক বলল, ওরে ফুলটুসি, 'মনে করো শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর'।

ফুলটুসি বলল, মনে করে রেখেছি। সুইসাইডটা মা কেন করতে যাবে আমিই আগে করে ফেলব।

আর বলল, তোদের থেকে আমাদের জ্বালা কত জানিস ? তোদের নাচ-গান শেখা কম্পালসারি ? নেভার! তোদের ফিগার নিয়ে মাথাব্যথা আছে ? চুল থেকে নখ পর্যন্ত সবকিছুর পরিচর্যা করতে হয় ? আবার রান্নাটিও শিখে রাখতে হয় ? সেলাই ? বোনা ? হাতের কাজ ? নেভার! নেভার! মেয়েদের মত দুঃখী আর কেউ নেই। আমি ঠিক করে ফেলেছি যা করবার করবই!

শিবাজী তো পরীক্ষা দেওয়ার পর অবস্থা বুঝলে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। তিলকের দৃঢ় সংকল্প, সাদা কাগজ রেখে চলে এসে সঙ্গে পাড়ি দেবে।

এদিকে মেজঠাকুমার মধ্যে অহরহ বিছের কামড়, ছুরির খোঁচা। ....অত আদরের ঘটাইয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারেন না তিনি, ভয় করে! চোখে মুখে যেন 'খুনী খুনী' ছাপ দেখতে পান! কারণ হঠাৎ একদিন শিবাজী আর ফুলটুসির হাতের তালু দেখে মাথা ঘুরে গেছে তাঁর। শামুকের খোলার বিদারণ রেখা বেখালুম লোপাট! চিহ্নমাত্র নেই। তাহলে উপায় ? খুব ভুল হয়ে গেছল আইডিন লাগিয়ে বেঁধে দেওয়ায়। সেই 'পাণিনি' না কে, সে কি হাত ফালা করার পর আইডিন লাগিয়েছিল ?

হায় ভগবান! এখন কাকে ধরেন তিনি ? তেত্রিশ কোটির

কাছে তো পুজো মানা হয়ে গেছে। শেষ ভরসা আবার সেই ওদের বুড়োমামা।

গোকুলপিঠে পাটিসাপটার নামে একশ থেকে দশটি বছর ম্যানেজ করে ফেলেছিল। মাছের কচুরির নামে আরো পাঁচটি বছর। তো যে কমাতে পারে সে ইচ্ছে করলে বাড়াতেও পারে। খাতা দেখিয়ে-ওলা মাস্টারদের মতই তো। তাহলে আবার যদি একবার ডেকে আনিয়ে ওই সব কিছুর সঙ্গে সরুচাকলি আর ভাজাপুলি যোগ করা যায়, দেবে না বাড়িয়ে? হয়ত সব নম্বরই একশর ওপর তুলে দেবে! 'মাসিমা' বলে অত ভক্তি করল।

কিন্তু হায়! মেজঠাকুমার এখন কপাল মন্দ। তিলকদের বুড়োমামা অফিসে দু'মাসের ছুটি নিয়ে কোন দেশে যেন বেড়াতে চলে গেছেন! মেজঠাকুমার মনের মধ্যে সর্বদা বিছের কামড় হবে না?

একেবারে 'শেষ ভরসা' ছিল, যদি ওরা হঠাৎ একটু ভাল পরীক্ষা দিয়ে আসে, তাহলে অন্তত খুনের হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়ল।

ঘটাই এসে হাঁক পাড়লেন, শুনেছ মেজখুড়ি? তোমার আদরের নাতিনাতনীদের ভাষা! শিবুবাবু এসে জোর গলায় বলছেন, 'গাড্ডু আমার মারে কে!' আর ফুলুবাবু বলছেন, 'মরা ছাড়া আমার গতি নেই।' এইসব ছেলেমেয়েকে কি করতে হয়? অ্যাঁ? 'কি' করতে হয়?

'কি করতে হয়'। শুনেই বুকটা ধড়াস করে উঠল মেজ-ঠাকুমার। চোখে অন্ধকার দেখলেন। ওই খুনেটার হাত থেকে কী করে ওদের রক্ষা করবেন?'

কিন্তু রক্ষা করবার ভাবনা কি আর ভাবতে হল মেজঠাকুমাকে? নিজেই তো তারা চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়ে গেল।

ঠিক দু'দিনের মাথায়, হঠাৎ যখন জানা গেল পাশের ফ্ল্যাটের সীতেশবাবুর ছেলে তিলক, 'নিরুদ্দেশ' হয়ে যাবার সংকল্প ঘোষণা করে চিঠি লিখে রেখে চলে গেছে, সেইদিনই গোলে হরিবোলের মধ্যে এরা দুজনও চিঠি লিখে রেখে হাওয়া হয়ে গেল।

শিবাজী লিখেছে, 'সামনে গভীর অন্ধকার। তাই নিরুদ্দেশের

পথে যাত্রা করছি। বিদায়!'

আর ফুলটুসি লিখে গেছে, 'পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেবার আগে একবার পৃথিবীটাকে একটু দেখে নিতে যাচ্ছি।'

ওদের বাড়িতে হৈ চৈ গোলমাল, পুলিশ আসাআসি, এই ফাঁকে এদের বাড়ির এই কাণ্ড!

ওই পুলিশদেরই ডেকে এ বাড়িটাও দেখান হল। কিন্তু পুলিশ আবার কবে নিরুদ্দেশের উদ্দেশ করে দিয়েছে?

মেজঠাকুমা বেঁকে বসলেন।

আমি আর এই শূন্যপুরীতে একদণ্ডও থাকব না। আমি তিষ্ঠোতে পারছি না। আমায় তোরা গাজনঘাটে পাঠিয়ে দে। সেখানেই পড়ে থাকিগে।

গাজনঘাটে।

হ্যাঁ, সেটাই মেজঠাকুমার শ্বশুরের ভিটে। অর্থাৎ ঘটাই পটাই ছোটাইদের পিতৃভিটে। কিন্তু সেখানে গিয়ে থাকবেন কি করে? সে তো জঙ্গল হয়ে আছে।

তাতে কি? আমার এখন জঙ্গলই মঙ্গল।...কেঁদেকেটে জেদ করে চলে গেলেন সেই দিনই।

মেজখুড়ি সত্যি চলে যাচেছন।

ঘটাই কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, আমি না হয় নিষ্ঠুর নির্মায়িক, ছেলেমেয়ে দুটোকে অধিক শাসন করি। কিন্তু সীতেশ বাবুর ছেলেটা নিরুদ্দেশ হয়ে গেল কেন?

মেজখুড়ি উদাসীনভাবে বললেন, তার কথা, সে জানে।

চলে গেলেন।

বলে গেলেন, আমি নিজের ইচ্ছে না হলে আসছি না। কেউ নিতে যেও না।

পৌঁছে দিয়ে এল পাড়ার একটি বেকার ছেলে। এসে বলল, উঃ। কী জঙ্গল। কী জঙ্গল। কী করে যে থাকবেন।

উপায় নেই। তাঁর বারণ।

বাড়িতে শোকের ছায়া! খাওয়া-দাওয়া বন্ধ বললেই চলে। ছোটাই আর ছোটাই গিন্নী এসেছেন। পটাই অফিসে ছুটি

নিয়েছেন। খবরের কাগজে কাগজে, রেডিওয়, টি ভি-তে নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা চলছে। 'শিবাজী ফুলটুসি তিলক' তিনজনের সম্পর্কেই। সীতেশবাবু এত কাতর হয়ে পড়েছেন যে এঁদের ওপরই ভার দিয়েছেন। কিন্তু সন্ধান নেই।

তারা কি আছে? এই ঘোষণা শুনছে?

ফুলটুসির মার কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফোলা। এই যন্ত্রণার মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ল পরীক্ষার রেজাল্ট। আর সেও এক যন্ত্রণার ব্যাপার! যমযন্ত্রণাই বলা চলে।

এ বাড়ির ছেলেমেয়ে দুটোর রেজাল্ট একেবারে ধন্যি ধন্যি করার মত। যা অভাবনীয়। আর তিলক? ব্র্যাকেটে ফার্স্ট।

নতুন করে হাহাকার পড়ে গেল।

নতুন করে কাগজে বিজ্ঞাপন! 'তোমরা ফিরে এস'। তোমাদের পরীক্ষার ফল 'এই'। 'এই'। ইত্যাদি।

ছোটাই বলল, মেজখুড়ি না হয় নিয়ে আসতেই বারণ করেছেন, দেখা করতে বারণ আছে? এই খবরটা অন্তত দিইগে!

পটাই বলল. কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে?

ঘটাই বলল, কী জানি জঙ্গুলে বাড়িতে সাপেই খেল না নেকড়েতেই খেল।

ছোটাইয়ের বৌ বলল, সারাক্ষণ প্রাণের মধ্যে হাহাকার। আমিও যাই তোমার সঙ্গে। ঘটাই বলল, আমিও যাই। বুকের মধ্যে কেমন জ্বালা জ্বালা করছে।…পটাই আর পটাইয়ের বৌ বলল, আমরা একা পড়ে থাকতে পারব না এই শূন্য বাড়িতে। তাহলে আর খুদে মেয়েটা এবং সন্ধ্যাই বা বাকি থাকে কেন? চল সদলবলে।

নিজেদের বাড়ি। তবু বহুদিন যাওয়া আসা নেই। পাড়ার সেই ছেলেটাও সঙ্গে গেল। বলল, দেখুন এখন গিয়ে কী দেখেন। সাপে কাটা হয়ে পড়ে আছেন কিনা।

শোকের সময় লোকবলই ভাল।

এতজন যাওয়া হচ্ছে, তাই বুকে বল।

তবু বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছচ্ছেন আর ভাবনা, গিয়ে কী দেখবেন!

কী দেখলেন ' কী দেখলেন ঘটাই কোম্পানি।

দেখলেন

একটি ফাটা ভাঙা চৌকির ওপর সারি সারি তিন মূর্তিমান। তাদের সামনে এক একটি বড় কাঁসারবাটিতে মুড়ি বেগুনি।

স্তম্ভিত হয়ে বললেন, এর মানে ?

'বললেন' না। সকলে মিলে একযোগে বলে উঠলেন,

এর মানে ? এর মানে ? এর মানে ? এর মানে ? এর মানে ?

এগিয়ে এলেন মেজখুড়ি।

বললেন, বাছারা খাচ্ছে এখন আর কটুকাটব্য করতে বসিসনি বাপু। ওদের কোন দোষ নেই। সব মতলব আমার। সব ষড়যন্ত্র আমার। আমিই এসব ব্যবস্থা করে, ওদের আগে পাঠিয়ে দিয়ে, পরে নিজে—

সকলে স্তম্ভিত।

ঘটাই অবাক, হতবাক, নির্বাক। তারপর বলে, সবার কিছু নেই। কিন্তু কেন ?

কেন ?

মেজখুড়ি উদাত্ত গলায় ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, কেন আবার ? ছেলেমেয়ে দুটোকে খুনের হাত থেকে বাঁচাতে। গণৎকার বলে গেল। ওদের কপালে গাডডু। আর তোমার হাত খুনের! কী হয় এর ফলে ? এদিকে—এই রোগা পটকা মেয়েটা! একে সামনে শাসানো হচ্ছে! পরীক্ষা খারাপ হলে গলায় দড়ি দেব, বিষ খাব, গঙ্গায় ঝাঁপ দেব।' মেয়ে বলল, মা কেন করতে যাবে ওসব ? আমিই করব। তো ভুলিয়ে ভুলিয়ে তুতিয়ে পাতিয়ে নিয়ে এসেছি। বলেছে, রেজাল্ট বেরলে দেখে তবে জঙ্গল থেকে বেরব।

হঠাৎ সমবেত কণ্ঠে একটি হাউ হাউ ক্রন্দনধ্বনি। ওরে বেরিয়েছে। বেরিয়েছে। খুব ভাল হয়েছে!

—অ্যাঁ।

—খু-ব ভাল হয়েছে!

মেজঠাকুমা বিজয়গৌরবে নাতিনাতনীদের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন, হবে না ? শামুকের খোলার গুণের কথা পুরাণে ইতিহাসে রয়েছে না ? আহা আহা উঠছিস কেন ? ফুলুরি কটা অন্তত

শেষ কর। ওমা ছোটবৌমা ধুলোয় শুয়ে পড়লে যে? ওঠো ওঠো। গণেশের দোকান থেকে আর চারটি মুড়ি ফুলুরি আনিয়ে নিই, কোন কালে বেরিয়েছ। চাও পাবে, অবিশ্যি মাটির ভাঁড়ে। এখন আবার কান্নার কী আছে?

কিন্তু তিলক? সে তো ব্র্যাকেটে ফার্স্ট!

পটাই বললেন, তা তুমি এমন ছেলে, তুমি কেন এদের দলে?

তিলক একটু মধুর হেসে বলল, এই এদের সঙ্গে একটু এক্সকার্সনে এসে গেলাম। উঃ মেজঠাকুমার যা ফার্স্টক্লাস রান্না।

এ ঘরে এসে ফুলটুসি আর শিবাজী বলল, আমাদের সঙ্গে এইরকম বিশ্বাসঘাতকতা! বললি—সাদা কাগজ গছিয়ে দিয়ে এসেছি।

তিলক মাথা চুলকে বলল, ভেবেছিলাম রে, কিন্তু কোশ্চেন পেপার হাতে নিয়ে কেবলই বাবার মুখটা চোখে ভাসে আর লিখে ফেলি।

—তা তখন বললেই পারতিস।

—বললে তোরা আমায় সঙ্গে নিতিস?

—উঃ। এতসব সামলেছেন মেজখুড়ি!

ঘটাই বলে ওঠেন, ডেঞ্জারাস লেডি।

মেজখুড়ি বললেন, তা না হলে আর তোমার মতন ডেঞ্জারাস ছেলে, মানুষ করে তুলি? তোর হাতের রেখাটা মুছে ফেল·ঘটাই। ওই খুনীর রেখাটা।

মুছে ফেলব? কী দিয়ে?

কেন শামুকের খোলা রয়েছে না? ও দিয়েই চেঁচে চেঁচে মুছে ফেললেই হবে।

শুধু একা বাটুন-ই
জেনে ফেলে

ছোট্ট থেকে বাটুনের টি. ভি. র প্রতি ভারী আকর্ষণ। ওর মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট মাপের ছবির মানুষগুলো নড়ে চড়ে, গান গায় কথা কয়, কী মজা লাগে।....বাটুন যখন ভালো করে কথা বলতেই শেখেনি, তখন পা উঁচু করে টি.ভি.র 'নব'টা ঘোরাতে চেষ্টা করতো, আর না পেরে বলতো, 'এতা থুলে দাও না।' অর্থাৎ 'খুলে দাও না।' যখন 'দূরদর্শনে' কোনো দর্শন নেই, তখনো বলতো 'ভালোতলে থুলে দাও না! হত্তে না!'

এখন অবশ্য বাটুন লায়েক হয়ে গেছে। নিজেই খোলে, বন্ধ করে। বছর ছয়েক বয়েস হলো, কম তো না! এখন বাটুনই দূরদর্শনের সবচেয়ে উৎসাহী দর্শক। 'খেলা'র সময় তো তাকে টি.ভি.র সামনে থেকে নড়ানোই যায় না! আর কখন কী প্রোগ্রাম হয়, সে সব তার মুখস্থ।

বাটুনের মা খুব রেগে বলে, লেখাপড়া মাথায় উঠে যায়, সব সময় টি.ভি. দেখা! সব বোঝে? শুধু সময় নষ্ট।

বাটুনের দাদু হেসে হেসে বলেন, শিশু হলো অনুকরণ-প্রিয় বৌমা। যা দেখে, তাই করতে যায়!

বাটুনের মা আরো রেগে বলে, আমি সবসময় দেখি, তাই বলছেন তো? তো আমি কোনো কাজ ফেলে করি?

আহা, বাচ্চারা কি অতো হিসেবের ধার ধারে? এই যে আমি যখন পুজো করি, তোমার পুত্তুর তো তখনো আমার পাশে গিয়ে বসে থাকে চোখ বুজে। পুজো কী, তা বোঝে? আমার মতো ভঙ্গী করে ইংরিজি খবরের কাগজখানাও খুলে পড়তে বসে! তো টি.ভি. দেখা এমন কিছু খারাপ নয়। ও থেকেও অনেক কিছু শেখা যায়। দেশ-বিদেশের দৃশ্য, খেলা, কথা, সব জানা যায়! খেলাধুলো দেখে, ওতে উৎসাহ জন্মায়। 'পড় পড়' করে বকাবকি করলে, বরং পড়ায় মন আরো কমে যায়, আতঙ্ক জন্মায়। দেখবে তাগাদা না দিলেই বরং পড়ালেখাকে ভালোবাসতে শিখবে! এই যে এইটুকু ছেলে কতো সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকে! কেউ তো বলে বলে করায় না?

ছবি এঁকে তো সব হবে !···বলে মা চলে যায়।

কিন্তু দাদুর সমর্থন ! তাই বাটুন ছবিও আঁকে, টি·ভি· ও দেখে। অদ্ভুত অদ্ভুতই হয়তো ছবি।

দাদু, এই দ্যাখো আমি একটা বাড়ি আঁকলাম, ঠিক নৌকোর মতো দেখতে। এটা জলেও চলতে পারবে, আবার 'বাড়ি' হয়ে— দাঁড়িয়ে থাকতেও পারবে !···দাদু এই দ্যাখো একটা ফুল এঁকেছি। বল তো কী ফুল ?

কী ফুল, তা অবশ্য দাদু বুঝতে পারেন না। তবু বলেন, এ তো দেখছি পদ্মফুল।

ধ্যেৎ ! তুমি ছাই জানো ! এটা তো আমার নিজের মাথা থেকে বানানো ফুল। এর কোনো নামই নেই !···দাদু, বলতো এটা কার ছবি ?

কার ছবি ? ঠিক বুঝতে পারছি না তো !

এঃ। নিজের ছবি নিজে বুঝতে পারছো না ?

আমার ছবি ? হা হা হা ! এর তো দেখছি মাথাভর্তি কালো চুল। আমার মাথাটি তো পাকা বেল ! আবার গায়ে কোট প্যাণ্ট !

আহা ! তুমি বুঝি চিরকাল বুড়ো ছিলে ? ছোটবেলায় কালো কালো চুল ছিলো না বুঝি ? তুমি যখন বাপীর মতন ছোট ছিলে, অফিস যেতে, তখন যে রকম ছিলে সেই ভেবে ভেবে এঁকেছি। তখন তুমি স্যুট পরতে না ? এই রকম ধুতি আর পাঞ্জাবি পরতে শুধু ? ইস্ ! স্যুট পরতে। মনে মনে 'দেখে' নিয়ে আঁকলাম।

আজও সেই রকম কিছু একটা আঁকতে আঁকতে হঠাৎ বলে ওঠে বাটুন, আচ্ছা দাদু, টি·ভি·তে আজকাল আর নিরুদ্দেশ প্রোগ্রামটা দেখায় না কেন ?

'নিরুদ্দেশ প্রোগ্রাম' ?···দাদু অবাক হন, সেটা আবাক কী ?

বাঃ। সেটা আবার কী ? কিছুই জানো না দেখছি। দেখোই না ভালো করে, তো জানবে কী ? যেমন 'নেপালী প্রোগ্রাম', 'পল্লীকথা', 'উচ্চশিক্ষার আসর' তেমনি একটা 'নিরুদ্দেশ প্রোগ্রাম' হতো না ? কতো কতো রকম জনের ছবি দেখিয়ে দেখিয়ে বলতো,

এতো তারিখ থেকে নিরুদ্দেশ। 'সন্ধান জানাইবার ঠিকানা—'

দাদু হা হা করে হেসে ওঠেন, সেটা আবার প্রোগ্রাম কি রে? ওতো বিজ্ঞাপন!

বিজ্ঞাপন! আহা, বললেই হলো! বিজ্ঞাপন মানে তো 'টুথপেস্ট', 'কাপড়কাচা সাবান', 'রসনা', 'হর্লিকস্', 'কেয়োকার্পিন' ইয়ে—

আরে থাম্ থাম্! হা হা হা। ওসব আলাদা! এ বিজ্ঞাপন হচ্ছে যাদের বাড়ি থেকে আপন জনেরা নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে, তাদের খুঁজে পাবার জন্যে বিজ্ঞাপন! ছবি দেখিয়ে চিনিয়ে দেয়, যদি দেখতে পেয়ে সন্ধান দেয়। তাই 'সন্ধান জানাইবার ঠিকানা—'

বাটুন দাদুর কথা শেষ না হতেই উত্তেজিত ভাবে বলে ওঠে, ইস্! আমায় বোকা পেয়ে ঠাট্টা হচ্ছে। ওরা সব সত্যি মানুষ? 'সাজা' মানুষ নয়?

কী মুস্কিল! সত্যি মানুষ হয়? সাজা মানুষ? হা হা! দেখিসনি কতো রকমের ছবি! ছেলেবুড়ো মেয়ে পুরুষ! হাজার হাজার। তো সেটা আর এখন দেয় না বুঝি?

'দেয় না বুঝি?' আহা! বোকা চণ্ডী। খুব বুদ্ধি! বললাম, 'দেখায় না কেন' আর বলা হলো দেয় না বুঝি? দেয় না-ই তো। কতো দিন আর দেখিনি। মা, ও মা, দাদুকে বলে যাও তো নিরুদ্দেশ প্রোগ্রামটা আর দেয় কিনা।

বাটুনের মা এসে দাঁড়ায়, কী হলো?

বাটুনের দাদু বলেন, আর কী হলো! শোনো বৌমা তোমার পুত্তুরের কথা। হা হা হা।

ব'লে বাটুনের বক্তব্যটি বৌমাকে শোনান। শুনে মাও হেসে অস্থির। তারপর বলে, ওইটাকে তুই প্রোগ্রাম ভাবিস? খুব তো বুদ্ধি তোর!

বুদ্ধির খোঁটায় ক্রুদ্ধ হয় না, এমন কে আছে? বাটুনও হয়। চোখমুখ লাল করে উত্তেজিত হয়ে বলে, হাসছো যে? তার মানে বলতে চাও, এতোদিন ধরে রোজ রোজ যাদের দেখাতো, হাজার হাজার জনকে, তারা সব সত্যিকার লোক। 'সাজা' লোক নয়?

ছোট্ট বড়ো সবাই? তারা সব্বাই হারিয়ে গেছে? ওই হাজার হাজার জন? 'নিরুদ্দেশ' মানেই তো হারিয়ে যাওয়া। অতো জন হারিয়ে যেতে পারে?

মা বলে, ওমা আমি আবার বলতে চাইবো কী? গেছেই তো হারিয়ে। না হলে বলবে কেন? কতো কতো বাড়ি থেকেই তো—হারাচ্ছে।

বাটুন প্রায় ফেটে পড়ে, ওরা সবাই সত্যিকার বাড়ির সত্যিকার লোক? ওই হাজার হাজার জন? এই বিশ্বাস করবো আমি? মজা দেখা হচ্ছে!

নাতির চোখমুখ দেখে অবাক হন দাদু। এতে এতো ক্ষেপে গেল কেন ছেলেটা? ভাবছে আমরা ওর সঙ্গে ঠাট্টা করছি? তাই ভাবছে বোধহয়। ও আবার ওর সঙ্গে ঠাট্টা করা সহ্য করতে পারে না। বকলে বরং রাগে না, ব্যঙ্গ করে কোনো মন্তব্য করলে রেগে আগুন হয়। এটা ভেবেই দাদু ওকে কাছে টেনে বলেন, না-রে, তোকে ঠাট্টা করছি না আমরা। সত্যি না হলে পয়সা টাকা খরচ করে দূরদর্শনে দেখায়? কেন, কেউ কেউ লেখে দেখিস না 'সন্ধান জানাইতে পারিলে এতো টাকা পুরস্কার।' দেখিস নি কোনোদিন?

বাটুন একটু ম্রিয়মান হয়ে যায়। বলে, সে তো দেখেছি।

তাহলে?

বাটুন ঢোক গিলে বলে, আমি ভাবি বোধহয় গোয়েন্দা গপ্পোর মতো কোনো গপ্পো! পরে কিছু হবে।

চমৎকার! মাথাটির একেবারে বারোটা বেজে গেছে।

ব'লে বাটুনের মা ঘর থেকে চলে যায়।

দাদু বলে, গপ্পো নয় ভাই। ওরা সত্যিই হারিয়ে-যাওয়া। খবরের কাগজেও তো এ রকম নিরুদ্দেশের খবর বেরোয়। ছবি দেয়। দেখিস নি?

বাটুনের কেন যে হঠাৎ গলাটা ভেঙে যায়। ও ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, এতো এতোরা সত্যিই হারিয়ে যায়?

যায় তো। আরো কতো কতো যায়। সব্বাই কি আর কাগজে ছাপায়, না দূরদর্শনে দেখাতে যায়? কতো গরীব দুঃখী আছে।

নিরক্ষর লোকরা আছে। তারা আপনজনদের হারিয়ে ফেলে শুধু কেঁদে কেঁদেই কাটায়।

বাটুন যেন চুপসে যায়। দাদুর হাঁটুতে হাত দিয়ে বলে, কিন্তু এতো জনেরা হারিয়ে যায় কেন দাদু ?

দাদু বলেন, তা কী করে বলি বল্ ? কতো জনের কতো কারণ। খুব ছোটুরা তো নিজেরা হারিয়ে যেতে পারে না। হয়তে বড়দের অসাবধানে হারিয়ে যায়। কতো জন বাড়ির লোকের ওপর রাগ দুঃখু করে চলে যায়, কতো জন হয়তো খুব বড়লোক হবো বলে, চেষ্টা করতে বেরিয়ে যায়। তাছাড়া কতো লোকের কতো রকম দুঃখ থাকে।

ছোট শিশুটাকে আর কী ভাবেই বা বোঝাতে বসবেন দাদু।

বাটুন মনমরা হয়ে বলে, সেই যেমন গপ্পোয় থাকে। 'মনের দুঃখে বনে চলে গেল'—সেই রকম ? তো সবাই বনে চলে যায় ?

দাদু এখন একটু হেসে ফেলে বলেন, কে যে কোথায় যায়, তাই যদি জানা যাবে, তা হলে আর নিরুদ্দেশ কী ? নিরুদ্দেশ মানেই তো হচ্ছে যার কোনো উদ্দেশ মেলে না। মানে আর কি, সন্ধান মেলে না। কিন্তু হঠাৎ আজ তোমার এ নিয়ে এতো মাথা ব্যথা কেন ভাই ?

বাটুন চমকে মাথায় হাত দিয়ে বলে ওঠে, মাথায় ব্যথা আবার কই ? বলেছি তোমায় মাথা ব্যথা ? তোমাদের যতো সব······ একটু থেমে বলে, ওদের কথা ভেবে আমার ভীষণ মন-যন্ত্রণা হচ্ছে ! 'কেন' যায় সে তো বললে, কিন্তু কোথায় যায় বলতে পারলে না তো ! এই হাজার হাজার জন এতো এতো ছেলেমেয়ে কোথাও তো যায় ? নিরুদ্দেশদের জন্যে অনে-ক অনে-ক দূরে ভীষণ দূরে একটা দেশ আছে কি ? সবাই সেখানে গিয়ে জমা হয় ?

দাদু নাতির মনমরা ভাব দেখে কী যেন ভেবে বলেন, তাই হয়তো আছে। সেখানে যতো হারানোরা গিয়ে জমা হয়। অনে-ক দূরে।

বাটুনের মুখে এখন একটু আলো ফুটে ওঠে। বলে—সেই সাত-সমুদ্দুরের ওপারে, না দাদু ? পাহাড়ের কাছে, বনের ধারে। অনেক হরিণ আর ময়ূর আছে সেখানে। তাই না দাদু ?

হুঁ! বোধহয় তাই!

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার হঠাৎ এক ঘোরতর ভাবনায় পড়ে গিয়ে বাটুন বলে ওঠে, কিন্তু দাদু, অতো অতো হাজার হাজার জনের জন্যে কে রান্না করে দাদু? গাদা গাদা রান্না তো।

দাদু হাসি চাপতে গিয়ে বিষম খেয়ে কাসতে কাসতে বলেন, তা অনেক সব রান্না-জানা গিন্নীরাও তো হারিয়ে যায়, তারাই রাঁধে বোধহয়!

বাটুনের মুখে নিশ্চিন্ততা ফোটে। হ্যাঁ ঠিক। তবে কাউকে তো বাজার করতে যেতে হয় না দাদু, বনের বাগানের গাছে তো সবই পাওয়া যায়। তাই না?

নিশ্চয়!

থালায় কি ডিশেও খেতে হয় না, কলাগাছ থেকে নিয়ে নিয়ে কলাপাতাতেই তো খাওয়া যায়। উঃ, কী মজা! হাজার হাজার জন একসঙ্গে খেতে বসে যায় নদীর ধারে। অনেক বন্ধু পেয়ে যায় সবাই। গপ্পো করে করে মনের দুঃখু চলে যায়। ও দাদু, শুনছো না যে? অনেক বন্ধু পেলে দুঃখু চলে যায় না?

দাদু কী উত্তর দিতেন কে জানে, ওদিক থেকে মার ডাক জোর শোনা যায়, বাটুন! গরমের ছুটি হয়ে দেখছি রাজপদ পেয়ে গেছিস। কাল থেকে হাতের লেখা করা হয় নি, তা মনে আছে? থাকবে কেন? গল্প পেলেই পৃথিবী ভুলে যাও তো! এসো শীগগির। দু-দিনের মিলিয়ে আট পাতা হাতের লেখা করো··· বলতে বলতে মা চলেই আসে। বলে, আর না হয় তো বসে বসে গল্পই করো। আমার আর কী? মুখ্যু বাঁদর হয়ে থাকবে। পরে বুঝবে ঠ্যালা!

মা প্রায় হিঁচড়েই টেনে নিয়ে যায় ছেলেকে। বাটুন মনে মনে জোরে চেঁচিয়ে ওঠে, ঠ্যালা বুঝতে আমার বয়েই গেছে। একটু বড়ো হলেই তো আমি হারিয়ে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবো। আর সেই অনে-ক দূরে নিরুদ্দেশের দেশে চলে যাবো।·······আর তোমরা কেউ খুঁজে পাবে না আমায়।

আটপাতার তিন পাতা লিখতে লিখতেই ঢুলুনি আসে বাটুনের। মাথাটা তার পড়ালেখার ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে।

তারপর বাটুন হাঁটতে থাকে।……হাঁটছে তো হাঁটছেই। কতো বন-জঙ্গল, কুঁড়েবাড়ি, রাজবাড়ি সব পার হয়ে পোঁছতে যায় সেই দেশটায়। পাহাড়ের কাছে, নদীর ধারে। যেখানে হরিণরা চরে বেড়ায়, ময়ূররা পেখম ধরে নাচে। নাম-না-জানা ফুলেরা ফুটে থাকে। আর হাজার হাজার জন নদীর ধারে খোলা আকাশের নীচে কলাপাতা পেতে ভাত খেতে বসে। সব্বাই সব্বাইয়ের চেনা হয়ে যায়! বন্ধু হয়ে যায়! আর নিরুদ্দেশ হয়ে কোথায় যায় সবাই, অন্য কেউ তা জানতে পারেনা—শুধু একা বাটুনই জেনে ফেলে।

হিতৈষী

ঘটনাটা বা দুর্ঘটনাটা যাই বলা হোক—ধরা পড়ল ট্রেনখানা হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে দৌড় দিতে শুরু করার পর। অর্থাৎ যখন আর কিছু করার নেই।

অথচ বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাওড়া স্টেশন আসার পথে ট্যাক্সিতে ধরা পড়লে, সহজেই প্রতিকার হয়ে যেতে পারত। কারণ তখনও ট্রেন ছাড়ার প্রায় ঘণ্টা সাড়ে তিন দেরি ছিল। অন্য অনেক-অনেক 'বাবু'র মতো শুভঙ্করবাবুরও 'ট্রেনাতঙ্ক' রোগ আছে। রাতের গাড়ি হলেও সকাল থেকেই তাঁর ট্রেন ফেল হওয়ার ভয়ে বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘোরে, আর গিন্নি ও ছেলেমেয়েকে অবিরাম তাড়া দিয়ে চলার প্রেরণা আসে।

তবু এত সত্ত্বেও ট্যাক্সিতে ধরা পড়লে শুভঙ্করবাবু হয়তো ভয়ঙ্কর মরিয়া হয়েই ট্যাক্সিকে পিছু হঠাতেন। কারণ ঘটনাটি যে ভয়ঙ্কর। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, তখন ধরা পড়ল না। কাজেই শুভঙ্কর ট্যাক্সিড্রাইভারকে জোরে ছোটাবার নির্দেশই দিয়ে চললেন।

তা হাওড়া স্টেশনে ঢুকে পড়েও তো ঘণ্টা আড়াই মল্লযুদ্ধে কাটল। তখনও যদি ছাই—কী বলছেন? মল্লযুদ্ধ কিসের? কিসের নয়? কুলির মাথায় মালপত্তর চাপিয়ে তার সঙ্গে দৌড়ের রেস দেওয়া, সামনে টাঙিয়ে রাখা রিজার্ভেশানের লম্বা লিস্টটি থেকে নিজেদের নামগুলো উদ্ধার করে ঠিকঠাক কামরাটিকে শনাক্ত করা, এবং শেষমেশ মানুষ আর মালেরা যথাযথ উঠেছে কিনা তা দেখে নেওয়া, এর কোনটা মল্লযুদ্ধ-তুল্য নয়? সবকিছুর সঙ্গে তো বুক ধড়ফড়ও চলছে।

তবে হ্যাঁ, একসময় অবশ্য যুদ্ধ মিটল।

শুভঙ্কর নিজের রিজার্ভ করা চার-বার্থের ফার্স্ট-ক্লাস কামরাটিতে গিন্নি আর ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঢুকে এসে চটপট দরজাটায় লক করে ফেলে একখানা বার্থে গদিয়ান হয়ে বসে বলে উঠলেন, "যাক বাবা। এতক্ষণে নিশ্চিন্দি।"

ফিচেল আর মিচকি দুই ভাইবোনও "কী মজা। গাড়িতে আর কেউ উঠবে না।" বলে চটপট আপার বার্থ দুটোয় উঠে পড়ে

পা ঝুলিয়ে বসে পা দোলাতে শুরু করল। গিন্নি সুখলতা খাবারের স্টকটি ঠিকমতো এসেছে দেখে নিশ্চিন্দি হয়ে গুছিয়ে বসলেন! এবং ঠিক তখনই গাড়িটা একটা জোর ঝাঁকুনি দিয়ে দৌড় দিতে শুরু করল দেখে 'দুর্গা দুর্গা, বলে দু' হাত জোড় করে চোখ দুটি বুজলেন।...শুভঙ্করবাবুর মনে তখনও পর্যন্ত শান্তির বাতাস! প্রাণে আহ্লাদ আহ্লাদ ঢেউ। কারণ ট্রেন ফেল করেননি।

জামাই নাগপুর থেকে বিলাসপুরে বদলি হয়ে আসা পর্যন্ত বড় মেয়ে ফুচকা অবিরত মা-বাবাকে চিঠি লিখছে, কিচেল-মিচকির গরমের ছুটি পড়লেই যেন সবাই মিলে একবার বেড়াতে আসেন। ওখানের কোয়ার্টারটা নাকি দারুণ সুন্দর আর মস্তবড়। তার সঙ্গে আবার বাগান। তা ছাড়া জায়গাটা নাকি নাগপুরের মতো অত ঘিঞ্জি নয়। জিনিসপত্তরও শস্তা।

বারবার বলায় ট্রেনাতঙ্কের রোগী ঘরকুনো শুভঙ্করবাবুরও শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছিল, বলে উঠেছিলেন, 'ঠিক আছে। লিখে দাও যাচ্ছি।''

তো এই পর্যন্ত সবই ঠিকই চলছিল। কিন্তু যেই মাত্র গিন্নি সুখলতা কপাল থেকে হাত নামিয়ে চোখ খুললেন, শুভঙ্করবাবু প্রশ্ন করে উঠলেন, "বেরোবার আগে নীচে নামার সময় বড় ঘরের দরজায় তালা লাগিয়েছিলে?"

সুখলতা জোর গলায় বললেন, "লাগাইনি আবার? ডবল তালা লাগানো হল তো! তোমার মতো টেনে-টেনে দেখেও নিয়েছি।"

"ঠিক আছে।" কিন্তু পরক্ষণেই একখানি বোমা!

"দরজা বন্ধ করার আগে আলো, পাখা টিভি, সব বন্ধ করেছিলে তো?"

"আলো! পাখা! টিভি?"

সঙ্গে-সঙ্গে সুখলতার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে এল। সেই ঝিমনো মাথার মধ্যে একটি দৃশ্য ফুটে উঠল, আলো-ঝকঝক ঘরের মধ্যে সামনের দেওয়ালে টিভির রঙিন পরদায় একটা হাসি-হাসি মুখ ব্রাশ নিয়ে ঘষে-ঘষে দাঁত মাজছে, আর ঘরের জানলার পরদা টেবিলঢাকা জোর বাতাসে উড়ছে, দুলছে।

তালা লাগাবার সময় এই দৃশ্যই ছিল বড় ঘরের মধ্যে।

সুখলতা নিথর পাথর গলায় শুধু বললেন, "আলো! পাখা! টিভি!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। কথাগুলো যেন কখনও শোনেনি মনে হচ্ছে।"

এত অপমান সহ্য হয় না।

সুখলতা নিজেকে সামলে নিলেন। জোর গলায় বললেন, "সব কিছু বন্ধটন্ধ করার কথা তো ছিল তোমারই। বলেছিলে না, আমাদের ওপর তোমার বিশ্বাস নেই।...নিজে ফ্রিজ বন্ধ করলে, রান্নাঘরে গ্যাসের চাবি পরীক্ষা করলে, 'পাম্প চলছে না তো' বলে খোঁজ নিলে...."

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ-সবই তো করা হয়েছিল। কিন্তু তোমরা তখন ওই ঘরটা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলে? মায়ে-মেয়েতে শেষপর্যন্ত টিভির সামনে হুমড়ে পড়ে বসেছিলে না?—কী? না একটা 'সিরিয়াল' চলছে, মাত্র আর দু-তিন মিনিট বাকি। যেন ওই তিন মিনিট না দেখা হয়ে থাকলে রাজ্য রসাতলে যাবে! জীবন বৃথা হয়ে যাবে।...উঃ। এই এক নিধি হয়েছে! টিভি। চমৎকার এক বোকা বাক্স। ওদিকে মস্তান বাহাদুরেরা আমার উপকার করতে ট্যাক্সি এনে হাজির করে বসে আছেন। মিটার উঠছে। তাড়া লাগানো।"

ফিচেল পা দোলানো থামিয়ে বলে উঠল, "মস্তান-বাহাদুরেরা আবার কে?"

"কেন? তোমাদের ওই 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর' ত্রিমূর্তি। সর্বদা যাঁরা পাড়া আলো করে রাস্তায় চরে বেড়ান। পাজির পা-ঝাড়া সব।...আমার দরকারে আমি যাচ্ছি ট্যাক্সি ডাকতে, তোরা ঝাঁপিয়ে এসে পড়লি কী জন্য? 'মেসোমশাই, ট্যাক্সি লাগবে? আপনি দাঁড়ান, আমরা দেখছি।'... ব্যস, তক্ষুনি এনে হাজির। যেন পকেটে ভরা ছিল ট্যাক্সি।...অথচ আমি দরকারের সময় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকি।"

সুখলতা বলেন, "তা ভালই তো করেছে।"

"থাক, থাক, আমায় আর ভাল দেখাতে আসতে হবে না।" এই যে ভালর ফল।...এখন ঘটনাটা কী ঘটেছে বুঝতে পারছ? এই দিন-কুড়ি ধরে বন্ধ ঘরের মধ্যে তোমার ওঁরা, ওই আলো

পাখা টিভিরা নাচবেন গাইবেন, ঘুরবেন, জ্বলবেন। কাজেই শেষ পর্যন্ত ইলেকট্রিকের তারগুলো গরম হতে-হতে ধরে নাও, তোমার প্রাণের টিভির বারোটা বেজে গেছে। সারা বাড়ির ইলেকট্রিসিটি—হয়তো জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাবে। সে আগুনে হয়তো বাড়িটাও—ও হো হো আমি আর ভাবতে পারছি না। আমি এখনই গিয়ে নিভিয়ে দিই গে।

বলেই শুভংকর হঠাৎ লাফ দিয়ে 'অ্যালার্ম চেনটা' টানতে এগিয়ে যান।

সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্য গিন্নি, কন্যে আর পুত্র একযোগে হাঁ-হাঁ করে ওঠে, "ও কী হচ্ছে? ও কী হচ্ছে? 'ফাইন' দিতে হবে, তা জানো? নয়তো পুলিশ কেসে পড়তে হবে।"

শুভংকর তখন ভয়ংকর থেকে প্রলয়ংকরে পৌঁছে গেছেন। সেই স্বরে বলে ওঠেন, "ফাইন! পুলিশ কেস! মানে? বিপদের সময় কাজেই না লাগল তো অ্যালার্ম চেন আছে কী করতে?"

মিচকিকে তখন শুভংকর টিভি দেখা নিয়ে একহাত নিয়েছেন। মিচকি তার শোধ নেয়। বলে ওঠে, "তা তো নিশ্চয়। কিন্তু রেলপুলিশ যখন 'জিজ্ঞেস করবে 'বিপদটা কী, তখন কী বলবে? 'বাড়িতে আলো-পাখার সুইচটা অফ করে আসতে ভুলে গেছি।'....এ জবাব পেলে নির্ঘাত ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরে দেবে বাবা।"

"হাজতে পুরে দেবে? মামদোবাজি নাকি?"

দিতেই পারে। অকারণ চেন টানা খুব দোষ, তা জানো না?"

শুভংকর তেজিয়ান গলায় বলেন, "অকারণ? বাড়িতে কেউ নেই, ইলেকট্রিকের তার জ্বলে যাচ্ছে, তা থেকে কত কী দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তার হিসেব আছে?"

সুখলতা গম্ভীরভাবে বলেন, "ঠিক আছে। তবে টানো। গাড়ি থামাও পুলিশকে 'জোর কারণ'টি দেখিয়ে এই অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে নেমে পড়ে হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ি পৌঁছে সুইচ নিভিয়ে এসো। টানো চেন।"

এ-কথাটা শুনে শুভংকর হঠাৎ নিভে যান। বলেন, "ঠিক আছে। বসে থাকি। হিসেব করো এই কুড়ি দিনে দিনরাত্তিরে আলো-পাখা আর টিভিটা কত ঘণ্টা চলবে।"

শুভঙ্করবাবুর কপাল! ছেলে মেয়ে দুজনেই তাঁর বিরোধী পক্ষ। চিরদিন মায়ের সাপোর্টার। তাই মায়ের বেহুঁশের কথাটি উচ্চারণমাত্র করছে না। বরং মেয়ে বলে উঠল, "ইস! ক্যালকুলেটারটা আনা হয়নি। আনলে এক্ষুনি হিসেব করে ফেলা যেত ক'ঘণ্টা!"

আর সঙ্গে-সঙ্গে ছেলে বলে উঠল, "সেই ঘণ্টাগুলো থেকে অবশ্য লোডশেডিঙের ঘণ্টাগুলো বাদ দিতে হবে। তা ছাড়া টিভি সারারাত সারাদিন চলে না।"

শুভঙ্কর মিইয়ে গিয়েও আবার জ্বলে ওঠেন, "না, চলে না। আমি তো দেখি দিনরাতই ওর সামনে হুমড়ি খেয়ে বসে আছ তোমরা! আর লোডশেডিং? ...কেন, কাগজে দেখিসনি সেদিন—বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেছেন, আর লোডশেডিং হবে না। হলেও দু-পাঁচ মিনিট।"

"সেই কথা বিশ্বাস করেছ তুমি বাবা?"

"করব না? খবরের কাগজের কথা বিশ্বাস করব না তো কি তোমাদের কথা বিশ্বাস করব?...আমি তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি পাখার রেগুলেটারটা গরম হতে-হতে জ্বলে গেছে...ধোঁয়া উড়ছে, পোড়া-পোড়া গন্ধ বেরোচ্ছে—ওঃ। আমি বিলাসপুরে পোঁছেই ফিরতি কোনও ট্রেনে কলকাতায় চলে এসে আলো, পাখা, টিভিকে বন্ধ করে দিয়ে, আবার সেইদিনই ফিরে আসব। আমার বাড়িটাকে তো আর ধ্বংস হতে দিতে পারি না। পাড়ার লোকে আগুন দেখে দমকলকে খবর দিলেও, রাস্তায় জ্যাম হওয়ার জন্য দমকলের আসতে দেরি হতে পারে। আর এসে পড়ার পরও জলের অভাবে আগুন নেভানো সম্ভব না হতে পারে।"

শুভঙ্কর আপার বার্থ থেকে একটা খুকখুক শব্দ শুনতে পেলেন। এবং দেখলেন সুখলতা আরাম করে শুয়ে পড়লেন। শুভঙ্কর ভেবে পেলেন না, এরা বিপদের গুরুত্বটা বুঝতে পারছে না কেন? ইলেকট্রিকের ব্যাপার থেকে কী হতে পারে আর না হতে পারে তা জানে না? শোনেনি কখনও? নাঃ, তাঁকেই বুঝতে হবে। পোঁছেই ফের...

কিন্তু সাধে বলা হয়েছে শুভঙ্করের কপাল!

শুভঙ্করের অতবড় বিদ্বান বুদ্ধিমান এঞ্জিনিয়ার জামাইও কিনা

বলে উঠল, "মাই গড। আপনি আলো পাখা নেভাতে এখনই একবার কলকাতায় ফিরে যেতে চান? নাঃ, কিছু মনে করবেন ন, আপনার মাথার একটু চিকিৎসার দরকার।"

জামাই হয়ে এই কথা।

তবে শুভঙ্করের বড় মেয়ে ফুচকা কিন্তু বরাবর বাবার সাপোর্টার। সে বলে ওঠে, তা ইলেকট্রিক থেকে ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর সব দুর্ঘটনা হয়ও তো, বাবা কিছু ভুল বলেননি। ভয়ে ভয়েই যেতে চাইছেন।"

জামাই বলল, "চাইলেই বা বা হচ্ছে কী করে? টিকিট পাচ্ছেন কোথায়?"

ফুচকা রেগে বলল, "তা হলে অন্য কোনও ব্যবস্থা করো? বাবা এখানে বেড়াতে এসে খেয়ে-শুয়ে সুখ পাবেন না।"

জামাই ভেবেচিন্তে বলল, "আচ্ছা তা হলে বাবাকে বলো, ওঁর পাড়ার কোনও চেনা কারও একট টেলিফোন নম্বর আমায় দিতে, ঘটনাটা জানিয়ে অফিস থেকে একটা ট্রাঙ্ককল করে দিয়ে দেখি যদি তাঁরা কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন।"

শুভঙ্কর গম্ভীর হাস্যে বললেন, "কী করে করবেন? ট্রাঙ্ককল-এ তো আর বাড়ির বাহান্নটা তালার চাবিগুলো চালান করা যাবে না বাবা। দিনকাল তো জানো।...বাড়িকে একেবারে নিশ্ছিদ্র দুর্গ করে রেখে আসা হয়েছে। মাছিটি পর্যন্ত ঢোকবার পথ রাখিনি।"

জামাই হতাশ হয়ে বলল, "তবে আর কী করা! আমি বলি কি ওটা ভুলে যান। মন থেকে মুছে ফেলুন। মনে হয় ইলেকট্রিক বিলটা কিছু বাড়া ছাড়া আর কিছু হবে না। বেড়াতে এসেছেন আমোদ করে বেড়ান, আরাম করুন, খাওয়াদাওয়া করুন। আপনার মেয়ে তো এই পনেরো দিন আপনাদের কী কী খাওয়াবে তার মেনু করে রেখেছে।"

শুভঙ্কর আকাশের দিকে চোখ তুলে বললেন, "বেড়াব! আরাম করব। খাওয়াদাওয়া করব? তা বলতে পারো। শুনেছি—রোম যখন জ্বলছিল, নিরো তখন বেহালা বাজাচ্ছিলেন।"

জামাই কষ্টে হাসি চাপতে গিয়ে কাশতে শুরু করে দেয়। সুখলতা বলেন, "কী হল, কাশি হয়েছে নাকি?"

এই সময় ফিচেল আর মিচকি ছুটতে-ছুটতে বা হাঁফাতে-হাঁফাতে আসে, "কী? এখনও তোমরা সেই সুইচ নেভানো নিয়ে পচা তর্ক চালিয়ে যাচ্ছো? মা, দিদির বাগানটা দেখলে না? দেখবে চলো তো। আমরা ভেবেছিলাম শুধু ফুলের বাগান। ফলেরও বাগান। গিয়ে দেখে হাঁ। আমগাছে ইয়া-ইয়া আম ঝুলছে, লিচুগাছে থোকা-থোকা লিচু! জামগাছে থোলো-থোলো জাম।···· পেয়ারাগাছে ডাঁশা-ডাঁশা পেয়ারা। বিশ্বাস করতে পারো—বাড়ির বাগানে আমগাছে আম, জামগাছে জাম, লিচুগাছে লিচু···ওঃ। ভাবা যায় না! বাবা, দেখবে চলো না।"

শুভংকর মলিনভাবে বলেন, "তোমরা দেখোগে বাবা!"

বড় মেয়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, "তা নাওয়া-খাওয়াটাই করবে চলো বাবা! এত দুঃখে যদিবা এলে···"

তা নাওয়া-খাওয়া অবশ্য করতেই হল। যতগুলো দিন থাকা হল, সেটা চালাতেই হল। এমনকী মেয়ে এই দিন-পনেরো ব্যাপী মহোৎসবের জন্য যা যা মেনু করেছিল, প্লাস তার ওপর মায়ে-মেয়ের মিলিত অবদানের আরও নতুন সংযোজন—সবই গলাধঃকরণ করতে হল শুভংকরকে। কারণ টের পাচ্ছেন আড়ালে-আবডালে সকলেই শুভংকরের মাথার চিকিৎসা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে।

করুক। শেষে যা আছে বুঝতে তার ঠ্যালা।

ক্রমেই তো ছুটির মেয়াদ ফুরোচ্ছে। ফিরতে তো হবেই কলকাতায়। তখন সুখলতা আর তাঁর প্রাণের পুত্তুর কন্যে মিচকি আর ফিচেল গিয়ে দেখবেন কী ঘটে বসে আছে।····ওঃ, ওই নাম দুটো রাখাই মহা ঝকমারি হয়েছিল। ফিচেল। মিচকি! কে রেখেছিল? আর সুখলতাও! কোনও দুশ্চিন্তার বালাই নেই! সুখের ঘাটতি নেই। এমনই তো ওই স্বভাব, মেয়ের বাড়িতে এসে আরও সর্বদাই যেন সুখের সাগরে ভাসছেন।····

আর অভাগা শুভংকর? তার অবস্থা? সর্বদাই হাজারটা কাঁকড়াবিছে কামড়াচ্ছে, একশোটা কুকুরে তাড়া করছে, রাস্তায় চলতে-চলতে পিঠের কাছে মোটরবাইক ছুটে আসছে, কানের মধ্যে পিঁপড়ে ঢুকে বসে আছে। চোখের সামনে রাশি-রাশি সর্ষেফুল ফুটে চলেছে।····

যাক। যম-যন্ত্রণার দিন-অবসান হল!

বিলাসপুর থেকে কলকাতাগামী ট্রেনে চড়ে বসল সবাই।

আর মেয়ে সঙ্গে বিপুল খাদ্যসম্ভার বেঁধে গুছিয়ে দিয়েছিল, তার সদ্ব্যবহারও করা হল? শুভঙ্করও তার অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। কারণ মনে তা জানেন, বাড়ি গিয়ে কিছুই জুটবে না।

কিন্তু বাড়ি? সেটা কি আছে?

কী অবস্থায় আছে? ঝলসে পুড়ে কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? না, ভেঙে ভেঙে ঘাড় গুঁজে, পড়ে আছে? মোড়ের মাথায় ঢুকতেই শুভঙ্কর চোখ দুটো বুজে ফেললেন!

তারপর? ট্যাক্সিটা থামতেই মিচকি বলে উঠল, "ও বাবা, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি কত মিটার উঠেছে দ্যাখো। মা ওসব বুঝতে পারে না।"

শুভঙ্কর চোখ খুললেন। মিটার দেখলেন। তারপর তাকিয়ে দেখলেন। অটুট অক্ষয় বাড়িটি তাঁর সকালের রোদে ঝলমল করছে। সম্প্রতি রং করানো হয়েছে কিনা। তাই আরও ঝলমল। রং একটু টসকায়ওনি।

সুখলতা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, "কী? পেলে তো সব? নাকি সব গেছে? শুধুশুধু ওখানে মেয়েটাকে অশান্তি দিলে।"

ফিচেল বলে উঠল, "বাবা। তোমার বাড়িটা তো দেখছি উপে যায়নি।" আর মিচকি মিচকে হাসি হেসে বলল, "বাবা! বাড়িটা সত্যি তো? না স্বপ্ন?"

অবিশ্বাস্য আনন্দে বিহ্বল শুভঙ্কর গম্ভীর হাস্যে বলেন, "বলতেই হবে ভগবান রক্ষে করেছেন। কথাতেই আছে রাখে কেষ্ট মারে কে!"

বলতে যা দেরি। চোখের সামনে 'ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর' ত্রিমূর্তি? "কী মাসিমা বেড়িয়ে আসা হল? এতদিনের জন্য বাড়ি বন্ধ করে গিয়েছেন কোথায়?"

দেখে শুভঙ্করের হাড় জ্বলে গেল। এই অকালকুষ্মাণ্ড অপয়ারা ওত পেতে বসে ছিল নাকি?

মাসিমা উত্তর দেওয়ার আগেই মেসোমশাই খেঁকিয়ে ওঠেন, "সে খোঁজে তোমাদের দরকার কী হে?"

একজন আপনমনে হাতের মাসল ফোলাতে-ফোলাতে উদাসভাবে বলে, "নাঃ। দরকার আর কী? তবে ভাবলাম হঠাৎ কোথায় কী ঘটল যে, বাড়ির মধ্যে আলো পাখা খুলে টিভি চালিয়ে রেখে বাড়িসুদ্ধ সবাই হাওয়া হল! ব্যাপারটা কী?

শুভঙ্কর থমকে বলেন, "বাড়ির মধ্যে কী করে গেছি না গেছি, তোমরা জানলে কী করে?"

তিনজনের একজন বলল, "টিভিটা তো আলো পাখার মতো নিঃশব্দ প্রাণী নয়। মেসোমশাই, তো পর পর দু' রাত দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম! বন্ধ বাড়িতে গান গায় কে? কথা বলে কে? ভূত নয়তো? তারপর বুঝে ফেলে..."

সুখলতা চাবি খুলে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেছেন। এখন শুধু ছেলেমেয়ে আর শুভঙ্কর। শুভঙ্কর বললেন, "শুনলে কোথা থেকে শুনি?"

"কেন? রাস্তা থেকেই। গাঁক-গাঁক করে...খোলা ছিল তো।"

শুভঙ্কর কান পেতে শুনে বলেন, "কই, কোথায়?"

"আহা, সে কী আর এখনও আছে। মেন সুইচটা বন্ধ করে দিয়ে ম্যানেজ করে ফেলা হয়েছে তো।"

শুভঙ্করের চোখ গোল হয়ে ওঠে। মেন সুইচটা বন্ধ করে ম্যানেজ করা হয়েছে মানে? কে করেছে? কীভাবে?"

তিনজনের আর-একজন তার চাপদাড়িতে হাত বুলোতে-বুলোতে মধুর হাসি হেসে বলে, এই আমরাই আর কি। ভাবলাম, কবে আসেন ঠিক কী। শুধু-শুধু কেন ইলেকট্রিকের বিলটা বাড়বে—বেচারি কেপ্পন মানুষটার।"

"কী? কী বললে? আমি কেপ্পন?"

"আহা। ইয়ে আর কি। এই লঙ্কা, ভাল কথাটা বল না।"

লঙ্কা অমায়িক হাসি হেসে বলল, "মিতব্যয়ী। অর্থাৎ হিসেবি আর কি! তো জাম্বো বলেছিল, বাড়িটা তো আষ্টেপৃষ্ঠে তালা মারা, লাইনটাই না হয় কেটে দে।...কিন্তু ভেবে দেখা গেল সেটা বেআইনি। বেআইনি কাজ তো আর করা যায় না?

কী বলো ফিচেল ?....তাই মেন সুইচটাই অফ করে দেওয়া গেল।”

“মেন সুইচ অফটা করলে কীভাবে, অ্যাঁ ?”

ফিচেল হতভম্ব হয়ে বলে, “সে তো বাড়ির মধ্যে দোতলায় সিঁড়ির মাথায়। সব তো তালা মারা।”

“ওই তো। তোমরা ভাই এমন প্রিকশান নিয়েছ। দেখলাম, যেন চারদিকে শুধু চোর আর ডাকাতই আছে, যেন পাড়ায় আমরা নেই। দেখব না। তো যাক! সে একরকম করে হয়ে গেল।”

ওদের ওই তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক মুখ দেখে শুভঙ্করের চেহারা আবার প্রলয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। বলেন, “একরকম করে হয়ে গেল মানে? কীরকম করে হয়ে গেল? তালাচাবি তো দেখছি সব আস্তই রয়েছে।”

“আঃ, ছি ছি মেসোমশাই, আমরা কি চোর, না ডাকাত? তাই তালাচাবি ভাঙার কথা উঠছে। ওসব বেআইনি কাজের মধ্যে লঙ্কা-পটকা নেই বুঝলেন? কর্তব্যের খাতিরে যেটুকু দরকার তাই করা হয়। ব্যস।....পাশের প্যাসেজের পাঁচিলটা ডিঙিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে আসা তো আর শক্ত ব্যাপার কিছু না। ছেলেবেলায় বল পড়লে, ঘুড়ি কেটে এসে পড়লে, কত অমন পাঁচিল টপকে ঢুকে এসেছি।....হ্যাঁ। তারপর অবশ্য একটু খাটুনি ছিল। রেনওয়াটার পাইপ বেয়ে ছাতে উঠে পড়া!”

“কী? কী? পাইপ বেয়ে ছাতে উঠেছিলে?”

পটকা চুলে হাত বুলোতে-বুলোতে বলে, “তা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা রেখেছিলেন আপনি?”

“ছাতে উঠেই বা কী কাঁচকলা হল? অ্যাঁ? ছাতের দরজায় তো ভেতর থেকে লোহার খিল লাগানো ছিল।”

“লোহার খিল!”

লঙ্কা বলে, “ও হ্যাঁ তা ছিল বটে। তবে ওটা কোনও ব্যাপার নয়। দরজাটার দুটো কপাটের মাঝখানে একটা পাতলা লোহার পাত ঢুকিয়ে একটু চাড় দিতেই তো একটু ফাঁক হয়ে গেল। তারপর আর-একটু চাড় দিয়ে খিলটা উঠিয়ে নামিয়ে ফেলা। খুবই সিম্পল ব্যাপার! ব্যস, জানিই তো ক'টা সিঁড়ি নেমে উঁচু দেওয়ালে আপনার মেন সুইচের মিটার বক্স।”

"জানো? অ্যাঁ?"

শুভঙ্কর তাঁর আশি কেজি ওজনের শরীরটা নিয়েও তুড়িলাফ খান। "বলি জানলে কী করে? আমার বাড়িতে কোথায় কী আছে জানলে কী করে হে মস্তানরা?"

'দেখুন মেসোমশাই। ওইসব মস্তান-মস্তান বলবেন না। মেজাজ খিঁচড়ে যায়। একেই তো হাতের কাছে একটা টুল-ফুল কিছুই রেখে যাননি। পটকাটা আমার কাঁধে পা দিয়ে উঠে তবে...."

"তবে তো আমার মাথা কিনেছ! ইচ্ছে করলে তো তোমরা আমার ঘরেটরে ঢুকে আলমারি সিন্দুকও খুলতে পারতে।"

লঙ্কা আবার নিরীহভাবে মাসল ফোলাতে-ফোলাতে বলে, "ইচ্ছে করলে অবশ্য অসম্ভব হত না।"

"অ্যাঁ। নিজে মুখে কবুল করছ? তোমরা তো দেখছি সাঙ্ঘাতিক ডেঞ্জারাস ছেলে। তোমাদের আমি পুলিশে দিতে পারি, তা জানো?"

"আঃ বাবা, কী হচ্ছে?"

ফিচেল রেগে ওঠে। শুভঙ্কর দমেন না। কড়া গলায় বলেন, "যা বলছি ঠিকই বলছি। খুব তো সাউখুড়ি দেখাচ্ছিলে বেআইনি কাজ করি না। একে কী বলে। অ্যাঁ? খুব আইনি? যে বাড়িতে আমি মাছি ঢোকবার পথ রেখে যাইনি সেই বাড়িয় মধ্যে ঢুকে তোমরা—একে কী বলে জানো? অনধিকার প্রবেশ। তোমাদের আমি জেল খাটাতে পারি। ঘানি টানাতে পারি তা জানো।"

"উঃ, মাথাটা একেবারে গেছে।"

বলে ফিচেল গটগট করে কোনদিকে যেন চলে যায়। আর মিচকি চেঁচাতে-চেঁচাতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়, "মা, ও মা, শিগগির এসো। বাবা লঙ্কাদা জাম্বোদাদের পুলিশে দিতে চাইছে। জেল খাটাবে বলছে।"

"কী? কী বলা হচ্ছে?"

সুখলতা আঁচলে ভিজে হাত মুছতে-মুছতে বেরিয়ে আসেন, এইসব সোনারচাঁদ হিতৈষী ছেলেদের তুমি পুলিশে দেবে? জেল খাটাবে? তা বলবে বইকী! সাধে কি আর বলেছে কলিতে

কারও ভাল করতে নেই। তোমার এই বাড়িখানা পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে যেত, তুমি সর্বস্বান্ত হয়ে যেতে। সেই দুর্ঘটনা থেকে এরা তোমায় রক্ষা করল, তা ভেবে দেখেছ? এরা নিজেরা রিস্‌ক নিয়ে এটা না করলে ফিরে এসে আমাদের পথে বসতে হত না?.... অথচ এদের দৌলতে সব একদম ঠিকঠাক। এসেই টিভিটা খুলে দিলাম। দেখি দিব্যি চলছে।...তোমরা কিছু মনে কোরো না বাবা!...তোমাদের মেসোমশাইয়ের কথা বাদ দাও।...আমাদের এতটা উপকার করলে তোমরা, আমার কাছে একদিন খেতে হবে। আমি নিজে রেঁধে খাওয়াব। কবে খাবে আর কী খাবে বলো?"

শুভঙ্করের মাথার উপরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে, গায়ে শত-শত বিছে কামড়ে ওঠে।....ওঃ। এর থেকে ঢের ভাল ছিল যদি সত্যিই এসে দেখতেন তাঁর এই বাড়িখানা আসবাবপত্তর সমেত পুড়ে কয়লা হয়ে বসে আছে।...যাঁকে এরকম ঘরভেদী বিভীষণ নিয়ে বাস করতে হয়, বাড়িতে তাঁর দরকারই বা কী?

দাঁত কিড়মিড় করতে-করতে টক ঝাল তেতো গলায় বলে ওঠেন, "হ্যাঁ বাবা সকল! বলে যাও, মাসিমার হাতে কী খাবে? ফ্রায়েড রাইস, না লুচি, পাঁঠার মাংস, না মুরগি। মুড়ো দিয়ে মুগের ডাল, না নারকেল দিয়ে ছোলার ডাল। বলে যাও।"

বলে এমন একখানা দৃষ্টি হেনে দুমদাম করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলেন, সেকাল হলে নিশ্চয় ছেলে তিনটে ঝলসে পুড়ে কাঠ কয়লা বনে যেত। কিন্তু কালটা তো সেকাল নয়, তাই ওই তিনখানি সোনারচাঁদ ছেলে, জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে থেকে সোনা হেন মুখে ঘাড় চুলকে অমায়িক হিতৈষীর গলায় বলে, "মুরগি-ফ্রায়েড রাইসই ভাল। লুচিফুচি করতে গেলেই ময়দাফয়দা মাখা! ফর নাথিং আপনার কষ্ট!"

এইজন্যই
কিস্‌সু হয় না

অফিসে সেকশনের বড়বাবু গজেন্দ্র চাকলাদার কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে উঠলেন, "মাই গড! ব্যানার্জি, তোমার পিসিমা এতদিন ধরে বাতে ভুগছেন অথচ আমায় একবার বলোনি? ছি ছি!"

'ব্যানার্জি' মানে প্রবুদ্ধ ভেবে পেল না তার পিসিমা বাতে কষ্ট পাচ্ছেন এ-খবরটি বড়বাবুকে জানানো জরুরি ছিল কেন। কিন্তু সে-প্রশ্নে গেল না প্রবুদ্ধ, বড়বাবু বলে কথা। মাথা চুলকে বলল, "না মানে...."

"থাক! আর মানে বোঝাতে হবে না। বুঝে নিয়েছি। ভেবেছিলে, এ-লোকটা আর ডাক্তার নয়, একে কী জন্য বলতে যাব? এই তো? কিন্তু আমাদের হচ্ছে ছেলেবেলায় পাঠ্যপুস্তকে পড়া শিক্ষা, যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দ্যাখো তাই, পাইলে পাইতে পারো অমূল্য রতন।....আমার সন্ধানে গেঁটে বাতের অব্যর্থ ওষুধ, অথচ তোমার পিসিমা।...."

প্রবুদ্ধ ভয়ে-ভয়ে বলে, "গেঁটে বাত? তা তো কই? মানে...."

"আবার 'মানে'! আমি বলছি আলবাত গেঁটেবাত। বললে না, শরীরের সব জয়েণ্টে ব্যথা? নট নড়ন-চড়ন, নট কিছু! এ একেবারে গেঁটে বাত হতে বাধ্য। বুঝলে? তুমি তো সেদিনের ছেলে, কতটুকু কী জানো?....যাক পিসিকে স্পেশালিস্ট দেখাবে বলে একদিনের ছুটি চাইছ? তো আমি তোমার দু'দিনের ছুটি স্যাংশান করে দিচ্ছি। তবে তোমার ওই স্পেশালিস্টকে দেখাতে নয়। সোজা চলে যাও বর্ধমানে খেজুরি গ্রামে। সেখানে গিয়েই একটা রিকশওলাকে বলবে, সে তোমাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে।"

প্রবুদ্ধ থতমত খেয়ে তাকায়। বর্ধমান তো জানি। কিন্তু ওই খেজুরি না গাজুরি কী যেন বললেন চাকলাদার!

বলল, "আজ্ঞে ওই খেজুরি না কী, ওটা কোথায়?"

"কী আশ্চর্য! 'ওটা কোথায়' তাই জিজ্ঞেস করছ? ওটা হচ্ছে আমার গ্রাম! আমার জন্মস্থান, আমার সাত পুরুষের ভিটে। ওখানের মাটিতে আমি....ওঃ তবুও মাথায় ঢুকল না

মনে হচ্ছে। শোনো, বর্ধমান স্টেশনে নেমেই. একটা সাইকেল-রিকশ ভাড়া করে চেপে বসে বলবে. সোজা খেজুরির গুপিমোক্তারের বাড়ি। ব্যস, তারপর আর কিছু ভাবতে হবে না। দারুণ ওষুধ হে। মোক্তারের জানা লোক। ওষুধ ডেকে কথা কয়! দেখো, ওনার ওষুধে তোমার পিসিমা তিনদিনের মধ্যে কথক নাচ নাচতে সক্ষম হবেন।"

পিসিমা! কথক নাচ!

প্রবুদ্ধর মাথাটা হঠাৎ ঘুরে যায়. চোখের সামনে ঝাপসা ছায়া দেখে।

"আহা অভ্যাস না থাকে না হয় নাচানাচি না করলেন। তবে শিওর তিনদিনে হাইজাম্প দিতে পারবেন। যাও, সোজা চলে যাও। বাড়ি গিয়ে পিসিমাকে সুখবরটা দিয়ে কাল ভোরের ট্রেনেই বেরিয়ে পড়ো গে। যা বলেছি মনে আছে তো?"

থতমত প্রবুদ্ধ বুদ্ধিহারা গলায় বলে. "আজ্ঞে, সব মনে আছে। তবে ইয়ে নামটা কী যেন বললেন? মানে কার বাড়ি …"

"আশ্চর্য! আসলটাই ভুলে যাচ্ছ? বলবে, গুপিমোক্তারের বাড়ি। ব্যস। রিকশওলা চোখ বুজে নিয়ে যাবে।"

প্রবুদ্ধ ভয়ে-ভয়ে বলে, "মোক্তার? না ডাক্তার?"

"ওঃ। তুমি ব্যানার্জি, বড্ড কম বোঝ। বাড়িটা মোক্তারেরই, তবে ওই বাড়িরই জানা একজন ওষুধ সাপ্লাই করেন।"

"দৈব ওষুধ?" ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করে প্রবুদ্ধ।

চাকলাদার এক চাকলা হাসেন। তারপর দার্শনিক গলায় বলেন, "দৈব বললে দৈব, অলৌকিক বললে অলৌকিক, ডাক্তারি বললে ডাক্তারি, আয়ুর্বেদ বললে আয়ুর্বেদ। টোটকা বললে টোটকা. হোমিও বললে হোমিও, বায়োকেমিক বললে বায়োকেমিক, হেকিমি বললে হেকিমি…"

প্রবুদ্ধ তাড়াতাড়ি বলে, "বুঝেছি সার! মানে অব্যর্থ! এই তো?"

"ঠিক। চাকলাদার আর-একখানা চাকলা হাসি হাসেন, এতক্ষণে মাথায় ঢুকেছে। গুড।"

সুখবরটি শুনে পিসিমা দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন,

"আহা! এতদিনে বুঝি ঠাকুর মুখ তুলে চাইলেন। তা তুই আর ওই ছাইয়ের পেসালিস্টের কাছে ধরনা দিতে যাসনে। তোর বড়বাবুর কথামতো সোজা ঠিক জায়গায় এগিয়ে পড়।"

"ঠিক আছে। কাল সকালেই তা হলে...."

কিন্তু বেঠিক করে বসতে চায় ভাইপো গাটু। ধরে পড়ল, "ও কাকু, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। কতদিন রেলগাড়ি চড়িনি।"

"তুই যাবি মানে? আর দু' বছর বাদেই না তোর মাধ্যমিক? এই মুখে স্কুল কামাই করবি?"

"আহা! কামাই আবার কী? স্কুলে এখন স্ট্রাইক চলছে না? রোজই তো কামাই। ও কাকু, আমি যাবই যাব।"

পিসিমা বললেন, 'তা এত করে বলছে যখন, নিয়ে যা বুধো! অজানা জায়গায় যেতে সঙ্গে কেউ থাকাও ভাল। কথায় বলে, অ্যাকা, না ভ্যাকা! ওর জন্য তো আর তোর আলাদা রিকশ-ভাড়া লাগবে না। একটা রিকশতেই তো—শুধু রেলগাড়ি ভাড়া।"

"আর, ওর যদি হুটহাট খিদে পেয়ে যায়?"

"যায় যাবে। খাওয়াবি। বর্ধমানে খাওয়ার অভাব? বলে, খাবারেরই দেশ! বেশি করে টাকা সঙ্গে নে, ব্যস।"

তবে আর ভাবনা কী!

পরদিন ভোরেই রওনা। সকাল ছ'টা পঞ্চান্নয় গাড়ি। ইলেকট্রিক ট্রেন। দেড় ঘণ্টায় বর্ধমান পৌঁছে দেবে।

তা দিলও। স্টেশনে সাইকেল রিকশরও রমরমা।

কিন্তু যেটায় বেশ নতুন সিট, দেখে দুই কাকা-ভাইপোয় উঠে বসল, সে লোক সওয়ারি তোলার পর ধীরেসুস্থে বলল, "আমি এখানে বেশিদিম আসিনি বাবু, ওই আপনার গুপি না কী যেন বললেন, ওনার বাড়িটাড়ি চিনি না। লোককে একটু জিজ্ঞেসবাদ করে নেবেন।"

কিন্তু কাউকে জিজ্ঞেস করার আগেই গাটুর দারুণ খিদে পেয়ে গেল। না পাবেই বা কেন? সেই কোন ভোরে উঠে কী একটু খেয়ে বেরিয়েছে। সত্যি বলতে প্রবুদ্ধরও একই অবস্থা!

রিকশওলাকে বলল, "তা হলে আগে একটা ভাল দেখে মিষ্টির দোকানে নিয়ে চলো। যেখানে চা-টাও পাওয়া যেতে পারে।"

"ঠিক আছে।"

তাই নিয়ে এল লোকটা। ভারী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দোকানটি। দেখে ভক্তি আসে। প্রাণভরে খাওয়া-দাওয়া করে পয়সা মিটিয়ে দেওয়ার সময় দোকানির কাছে কথাটা পাড়ল প্রবুদ্ধ, "আচ্ছা, বলতে পারেন এখানে গুপিমোক্তারের বাড়িটা কোথায় ?"

"গুপিমোক্তার ? উই তো ওই মোড়ের মাথাটা ছাড়িয়ে লালরঙা বাড়ি। তো আপনাকে তো এখানে লোতুন দেকচি, বয়েসও কাঁচা। সঙ্গে এট্টা খোকা। হঠাৎ ওই ঘোড়েল গুপিমোক্তারের খবর ক্যানে ? কেসটা কী ?"

প্রবুদ্ধ কিছু বলার আগেই গাঁটু তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "গেঁটে বাত !"

"গেঁটে বাত !"

দোকানি প্রবুদ্ধর লম্বা ছিপছিপে হালকা চেহারাটার দিকে একবার অবাক চোখ মেলে বলে, "আপনার ? না এই খোকার ?"

"আঃ। আমাদের হতে যাবে কেন ? আমার পিসঠাকুমার !"

"অ। তা ব্যাধির জন্য ডাক্তারের বাড়ি না গিয়ে মোক্তারের বাড়ি ক্যানে ?"

"মানে একজন বলে দিয়েছিলেন, ওখানেই নাকি কার কাছে বাতের ওষুধ পাওয়া যায়।"

"ভুল খবর। মোক্তারের বাড়ি আবার ডাক্তার কোতা ?" বলে মিষ্টির দোকানি পয়সাগুলো গুনে ফতুয়ার পকেটে পুরে ফেলে বলে, 'বামুনপাড়ায় খোঁজ করে দেখুন, ওখানে বোধ হয় গুপিডাক্তার বলে একজন আছে। ওহে রিকশওলা, এনাকে বামুনপাড়ায় নিয়ে গিয়ে দ্যাখো…"

"বামুনপাড়া ! সেটা আবার কোন দিকে ?"

"কী মুশকিল, বামুনপাড়া চেনো না ? ওই তো বাজারের পেছনের রাস্তাটা ধরে একটু এগোলেই…"

"ভাল ঝামেলা…" বলে রিকশওলা আবার তার গাড়ির চাকায় দম দেয়।…তো কী ভাগ্যি, বামুনপাড়ায় ঢুকতেই সামনে একজনা, পিতলের ফুলের সাজি হাতে বামুন ঠাকুর। গায়ে নামাবলী, মাথায় টিকি।

তিনি প্রশ্ন শুনেই বলে ওঠেন, "অ। ওই গুপে সরকারের কতা কইছ? তো সেডা আবার 'মানুষের' ডাকতার হইল কহন? সেডা তো ঘুরার ডাকতার!"

"ঘুরার! মানে! ঘুরা কী!"

"অ্যাঁ! ঘুরা মানে বুঝছ না? ঘুরা! ঘুরা! যে ঘুরা ঘাস খায়, গারি টানে। পুস্তকের ভাষায় হয় ঘোটক।"

"ও।" প্রবুদ্ধ বলে, "মানে ঘোড়ার ডাক্তার? অর্থাৎ 'ভেটারিনারি সার্জন'? অর্থাৎ পশুচিকিৎসক।"

"হ! পুশাকি ভাষায় ওই সব কয়। আমরা তো 'ঘুরার ডাকতারই কই। অর নাম তমারে কয়েদেচে কেডা?"

গাঁটু তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "কাকুর আপিসের লোক। এইখানে বাড়ি। বলে দিয়েছেন গেঁটে বাতের ওষুধ দ্যান তিনি।

ঠাকুরমশাই চোখটা একটু কুঁচকে বলেন, "বুজচি না। অন্যরে শুদোও!...চলে যান অন্যদিকে।"

রিকশওলাটা বলে ওঠে, "আমারে ছেড়ে দ্যান বাবু। এখেনের কোনও জানাশুনো রিকশ ধরুন। আমি লতুন লোক।',

"বাঃ এখন আবার কোথায় রিকশ পাব?" বলে প্রবুদ্ধ একটু বিরক্তি দেখায়। কিন্তু গেরস্তর বিরক্তিতে আবার কার কী? সে বলে ওঠে "ওই তো ওই বাজারের ধারে রিকশ স্ট্যান্ড, ধরিয়ে দিচ্ছি...."

"তা ধরিয়ে দেয় একটা, আর নিজের এতক্ষণ হয়রানির জন্য বেশ মোক্ষম একখানি ভাড়া চেয়ে বসে।"

প্রবুদ্ধ হতাশ ভাবে আর সকলের দিকে তাকিয়ে বলে, "কী হে? স্টেশন থেকে এইটুকু আসতে আর দোকানে বসে একটু চা-খাবার খেতে তিরিশ টাকা?"

তা যাদের দিকে তাকায় প্রবুদ্ধ বুদ্ধুর মতো, তারা কার দলে যাবে? 'স্বজাতি' কে ছেড়ে ওই কলকাতার বাবুটির কোলে ঝোল টানবে? তারা গম্ভীরভাবে বলে, "ওইরমই পেয়ে থাকি আমরা বাবু। বলছে অনেক ঘুরতে হয়েছে।"

প্রবুদ্ধ আর কী করবে। করকরে তিনখানা দশ টাকার নোট ধরে দেয় লোকটার হাতে।...গাঁটু ফিসফিস করে কাতর গলায়

বলে, "সব টাকা শেষ করে ফেলছ কাকু? আমার যে আবার খিদে পাবে।"

প্রবুদ্ধ একবার আদরের ভাইপোর দিকে কটমট করে তাকায়। তারপর ইশারায় বলে, "আছে আরও।"

ইত্যবসরে গাড়ি বদলাবদলি আর ওই দরাদরির মধ্যে বাজার-যাত্রী বা বাজার-ফেরত বেশ কয়েকজন জমে পড়েছে।

সকলের একযোগে একই প্রশ্ন, "কী ব্যাপার? কোথা থেকে আসছেন? যাবেন কোথায়? কার বাড়ি? কোন পাড়ায়?"

প্রবুদ্ধর ঘাম ঝরতে থাকে। কষ্টে বলে, "ইয়ে "গুপিডাক্তারের বাড়ি।"

"গুপিডাক্তার? এখানে আবার ডাক্তার গুপি কোথায়? অ্যালোপ্যাথ, না হোমিও?"

"ঠিকানা কী?"

প্রবুদ্ধ রুমাল বার করে ঘাম মুছতে-মুছতে বলে, "না, মানে, ঠিক ডাক্তার কি না জানি না। তবে শুনে এসেছি বাতের ওষুধ টষুধ দ্যান।

গাটু ফস করে বলে ওঠে, "গেঁটে বাতের।"

"গেঁটে বাতের ওষুধ!" একজন টাকমাথা ভদ্রলোক হাতের বাজার ভর্তি থলিটা বাগিয়ে ধরে এগিয়ে এসে বলেন, "গেঁটে বাতের ওষুধ? দৈব? স্বপ্নাদ্য?"

"আজ্ঞে, তা তো জানি না। তবে যিনি বলেছিলেন, তিনি তো বলে দিয়েছিলেন গুপি নাম করলেই, রিকশওলা বাড়ি চিনিয়ে নিয়ে যাবে।"

টাকমাথা কথাটা শুনে একটা অবজ্ঞার ভঙ্গি করে নস্যাতের গলায় বলেন, "বললেই হল? গুপি কি এ-তল্লাটে একটা? এ-পাড়া ও-পাড়া মিলিয়ে কোন না দেড় কুড়ি গুপি। বেশি তো কম নয়।"

প্রবুদ্ধ পুরোপুরি বুদ্ধু বনে গিয়ে ভ্যাবলা গলায় বলে, "দেড় কুড়ি গুপি?"

"বললুম তো বেশি বই কম না। হবে না কেন? এ হল গিয়ে প্রভু গুপিনাথের এলাকা। একদম জাগ্রত দেবতা। এরা

হল সব ওই ঠাকুরের 'দোরধরা ছেলে'। এই আমারই এক জ্ঞাতি জ্যাঠার নামই তো গ্নপীকৃষ্ণ! লোকে অবশ্য বলে 'ঢ্যাঙা গ্নপি'। তো সকলের নামের সঙ্গে 'পদ', 'চরণ', 'দাস', 'কৃষ্ণ', 'হরি' ইত্যাদি প্রভৃতি থাকে এক-একটা, তবে চেনাচিনির সন্বিধের জন্য লোকে একটা চিহ্ন দিয়ে রাখে। যেমন উনি 'ঢ্যাঙা গ্নপি'। তেমনই 'বেঁটে গ্নপি', 'কালো গ্নপি', 'ফরসা গ্নপি', 'ভুঁদো গ্নপি'. 'চিমড়ে গ্নপি', 'কানা গ্নপি', 'ট্যারা গ্নপি', 'ন্যাড়া গ্নপি', 'হোঁতকা গ্নপি', কবি গ্নপি', 'ল্যাংড়া গ্নপি', 'কানে-খাটো গ্নপি', "পেটন্ক গ্নপি', 'চোরা গ্নপি', 'কিপটে গ্নপি', 'ফিচেল গ্নপি', 'ক্ষয়া গ্নপি', 'ডাগড়াই গ্নপি', 'মস্তান গ্নপি', 'মাস্টার গ্নপি', 'টেকো গ্নপি'. 'কোঁকড়াচুল গ্নপি', 'বৌ মরা গ্নপি', 'কুমিরেখেগো গ্নপি', এগন্লো তো আমার জানা। অজানা আরও কিছন্ থাকতে পারে। অথচ আপনার 'তিনি' বলে দিলেন, গ্নপি নাম করলেই হবে। আরে আমাদের আরও এক গ্নপিও তো রয়েছে।....'দাঁতাল গ্নপি'।

শন্নতে-শন্নতে প্রবন্দ্ধর মাথা ঘন্রতে শন্রন্ করেছে। বলল, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, একটন্ থামান। নোটবন্কটা বার করে এই 'গ্নপি-লিস্টটা' লিখে নিই।"

সঙ্গে সঙ্গে গাঁটন্ তড়বড়িয়ে বলে ওঠে, "লিখে নিতে হবে না কাকু, আমার সব মন্খস্থ হয়ে গেছে। আঠাশটা হয়েছে। বলব? ঢ্যাঙা গ্নপি, বেঁটে গ্নপি, কালো গ্নপি...."

প্রবন্দ্ধ চোখ পাকিয়ে তাকায়, "তুই থামবি?"

টেকো ভদ্রলোক বলে ওঠেন, "আহাহা, বকছেন কেন? এ তো দেখছি একখানি জিনিয়াস। আমার নাতিটাকে স্টকের নামতাটা মন্খস্থ করাতেই বিশ দিন লেগেছে। যাক, খোকা আরও দন্টো নাম যোগ করে। 'ওস্তাদ গ্নপি', আর 'জেলখাটা গ্নপি', ...এরা অবশ্য এটু দন্রপাড়ার। তো এদের মধ্যে যে কেউ বাতের ওষন্ধ দেয়, তা তো কই শন্নিনি। অবশ্য সবাইয়ের সঙ্গেই যে খন্ব দহরম-মহরম আছে, তা তো নয়। ঠিক কাকে যে ধরবেন আপনি, সেটাই তো সমস্যা। ঠিকানাটা না এনে ঠিক করেননি। তবে যা মনে হচ্ছে 'চিমড়ে গ্নপি'ই হতে

পারে। ওই একটু তান্ত্রিক-ফান্ত্রিক গোছের আছে। মদন, তুই এই বাবুকে খেলার মাঠে ধারের চিমড়ে গুপির বাড়িতে নিয়ে যা। জানিস তো বাড়িটা? ইট বার করা, দাঁত খিঁচোনো একতলা বাড়িটা?"

রিকশওলা মদন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। এখন তার গাড়ির সাইকেলে প্যাডেল করে স্পিড দিয়ে বলে, "অনেক টাইম লস হয়েছে বাবু। সেটা পুষিয়ে দিতে হবে।"

হবেই! কী আর করা! ডুবতে যখন নামা হয়েছে, 'জামা-কাপড় ভিজে যাচেছ' বললে চলবে কেন? পিসির ব্যামোটা যদি সারে সেটাই পরম লাভ।

কিন্তু চিমড়ে গুপি কি কোনও আশার বাণী শোনালেন প্রবুদ্ধকে? তিনি তাঁর বাড়িখানার মতোই খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, "গেঁটে বাতের ওষুধ? আমি? কস্মিনকালেও না। আমি অমন ছ্যাঁচড়া কাজটাজ করি না, বুঝলেন। আমার কাজ হচ্ছে 'পাগল ভাল করবার'। ওষুধ আছে। তেমন কোনও রুগি আছে হাতে? থাকে তো বলুন?"

প্রবুদ্ধ মনে-মনে বলে, এখন নেই, কিন্তু হঠাৎ হাতে এসেও যেতে পারে। মুখে বলে, "না। তেমন কেউ নেই। আচ্ছা, নমস্কার।"

মদন সবই শুনেছে। সে গাড়িতে উঠতে-উঠতে বলে, "আমার মন নিচেছ বাবু, বোধ হয় কালো গুপির কাছে জিনিসটি মিলবে। কালো গুপির গিন্নি অনেক কিছু জানে!···তেনার সূত্রেই হয়তো····"

হ্যাঁ। তা জানেন বটে 'তিনি' অনেক কিছু। মানে ওই কালো গুপির গিন্নি। তিনি জানেন শনি-মঙ্গলে নিমপাতা ছুঁতে নেই, ভরা অমাবস্যায় নখ কাটতে নেই, সকালবেলায় এক চোখ দেখাতে নেই, কারও কোথাও যাত্রাকালে পিছু ডাকতে নেই, তা ছাড়া····"

কিন্তু এসব তো প্রবুদ্ধর পিসিমাও জানেন। আরও অনেক অনেক বেশি জানেন। ভরদুপুরে এক শালিখ দেখলে আর ভরসন্ধ্যায় আকাশে একটি তারা দেখলে, সেই ভয়ানক ভয়ের

প্রতিকারমন্ত্রটি কী তাও জানেন। তাই বলে কি গেঁটে বাতের প্রতিকার-সংক্রান্ত কিছু জানেন? হুঁঃ। তা জানলে কি তাঁর এই অভাগা ভাইপোটাকে তারও একটা বেচারি ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে এই বর্ধমান জেলার এক গ্রামে এসে 'গুপি অরণ্যে' দিশেহারা হয়ে, আসল গুপি খুঁজতে-খুঁজতে বেমক্কা রিকশভাড়ার মিটার বাড়িয়ে চলতে হত?

প্রবুদ্ধ ভাবল, আমাদের অভিজ্ঞতা কত কম। একই অঞ্চলে যে এত গুপি থাকতে পারে এ-কথা কি কোনও দিন ভাবতেও পারতুম, এই খেজুরি না গাজুরিতে না এলে?

কালো গুপি বাড়ি ছিলেন না। তাঁর গিন্নিই দরজা খুলে দিলেন। এবং প্রবুদ্ধর আসার কারণ শুনে বলে উঠলেন, "উনি? উনি দেবেন বাতের ওষুধ? নিজেই তো বাতে জরজর। গেছেন কবরেজখানায়। মালিশের ওষুধ আনতে! দেখো গে বাবা, অন্য কোথাও। আরও কত গুপি আছে এ-তল্লাটে। কাছাকাছি অন্য তল্লাটেও আছে। এই তো নতুন চকে রয়েছে 'জোড়া গুপি'। যমজ দুই ভাই। বয়েস কম। ফুটবলে দারুণ নাম। কিন্তু তারা তো আর...."

রিকশওলা বলেছিল কালো গুপির গিন্নি অনেক কিছু জানে। তাই প্রবুদ্ধ আশায় ভর দিয়ে বলল, "আচ্ছা, আপনি কি আন্দাজ করতে পারেন মাসিমা কোন পাড়ায় গেলে, 'ঠিক গুপি'কে পেতে পারি?"

'মাসিমা' শুনে মহিলা একটু হৃষ্ট হয়ে বললেন, "বলা শক্ত বাবা! তা জানলে তো নিজের বাড়ির রুগিরই চিকিচ্ছে করাতে পারতুম। তো তোমাকে এ খবরটি দিয়েছে কে?"

"কলকাতার এক ভদ্রলোক। অফিসের। তাঁর না কি এখানেই বাড়ি।"

"কী কান্ড দ্যাখো! ঠিকানাটা ঠিকমতো বলে দেবে তো, তোমার অবস্থাটি তো দেখছি প্রায় বিশল্যকরণী খুঁজতে আসা রামায়ণের হনুমানের মতন। হিহিহি, তো হনুমানের মতন তো শক্তি নেই যে, পুরো গ্রামটিকেই উপড়ে তুলে নিয়ে যাবে। হিহি।

এখন আসল গুপি খুঁজতে দোরে-দোরে কড়া নেড়ে বেড়াও গে।” বলে দিব্যি নিজের দরজাটি বন্ধ করে দিলেন মুখের সামনে।

আর গাটু আবদারের গলায় বলে উঠল কিনা, “ও কাকু, আমি জোড়া গুপি দেখব। ফুটবল খেলোয়াড় যমজ গুপি!”

প্রবুদ্ধ দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলে, “তোকে এবার চড়কগাছ দেখিয়ে ছাড়ব। শুনলি না কম বয়েস! ওষুধের কী জানবে?···ওহে বাপু মদনচন্দ্র রাস্তায় লোককে একটু জিজ্ঞেস করে দ্যাখো না, ওইসব ট্যারা গুপি ন্যাড়া গুপিরা কে কোথায় থাকেন। এতদূরে এসে হেস্তনেস্ত না দেখে ফিরে যাব?”

মদন গম্ভীর ভাবে উত্তর দেয়. “আমার অত টাইম নাই সার।”

“টাইম নেই? তুমি তো রিকশই চালাও? নাকি অন্য কাজ আছে?”

“আজ্ঞে, রিকশই চালাই। তবে কি না এই প্রকার জনে-জনে শুধোতে হলে টাইম বিস্তর লস হবে। তবে হ্যাঁ, ঘণ্টা হিসেবে যদি ভাড়া ঠিক করেন, আলাদা কথা।”

প্রবুদ্ধ অকূলে কূল পায়। “আচ্ছা তাই করো। ঘণ্টায় কত?”

“আজ্ঞে, ঘণ্টায় বাইশ টাকা। তাই পেয়ে থাকি।”

“অ্যাঁ? তাই দেয় সবাই? বলো কী?”

“যার দরকার সে দিতে বাধ্য হবেই বাবু। তো না পোষায় আমায় ছেড়ে দ্যান।”

‘‘সর্বনাশ! তাই কখনও দেওয়া যায়?’’ এই অচেনা-অজানা রাস্তায় এখন কার ভরসায় গুপি খুঁজে বেড়াবে প্রবুদ্ধ।”

“ঠিক আছে তাই চলো। এখন ক’টা?”

“আপনার হাতেই তো ঘড়ি বাঁধা।”

তা বাঁধা ঘড়ি জানান দিল, এখন এগারোটা দশ। অতএব আগের এতক্ষণকার ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে, ‘মিটার’ শুরু হল।

কিন্তু শুধু মিটারই উঠছে, কাজ হচ্ছে কই? সত্যিই যাকে বলে ‘দোরে-দোরে কড়া নাড়া’ দিয়ে চলেছে গুপি-অন্বেষণ। তা আছে বটে দেদার গুপি, তা বলে তারা কি নিষ্কর্মা? নাকি অচল অনড়?

“খ্যাঁদা গুপি? তিনি ছেলের কাছে দুর্গাপুরে। তবে বাতের

ওষুধ শুনে তাঁর ভাইপো আকাশ থেকে পড়ল। "জেঠু? বাতের ওষুধ? পাগল নাকি?"

"মাস্টার গুপি? তিনি ছুটি নিয়ে মেয়ের কাছে গেছেন জামশেদপুরে। তা তাঁকে দরকারটা কী?"

"কিছু না। এমনই।"

"এমনি? বাড়ি বয়ে খোঁজ নিতে এসেছ? ইয়ার্কি? মতলবটা কী? ডাকব নাকি পাড়ার ছেলেদের?"

বোঁ করে রিকশয় উঠে পড়তে হয়।

দুধওলাগুপি বলে ওঠে, "বুঝেছি বাবু, কাঁকে খুঁজছেন। 'গুনিন গুপি?' হ্যাঁ ছিলেন বটে একখানা 'বেক্তি'। সকল রোগ-ব্যাধির ধন্বন্তরী! গেটে বাতের? সে তো অব্যর্থ। কিন্তু তিনি তো অনেক দিন গত হয়েছেন।"

"অ্যাঁ! গত হয়েছেন?"

"তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার আছে কী বাবু? গত হওয়াই তো মনিষ্যির ধর্ম! মনিষ্যি মাত্তরকেই একদিন-না-একদিন গত হতে হবে। যে ক'টা দিন চরে বেড়ানো যায়।"

ন্যাড়া গুপি বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, করি বটে টোটকা-টুটকি। তা বলে সাবালক মনিষ্যিদের নয়। এই কুচোকাচাদের আমাশা, ন্যাবা, ঘুংড়ি কাশি, এইসবের কিছু ওষুধ আছে আমার নিকট। তবে একটা কাজ করতে পারেন, ওই বাঁশঝাড়টার পিছন বরাবর একখান পাকা দেওয়াল টিনের চালা বাড়ি দেখবেন, ওইখানে এক গুপি আছে, রাতদিন গাছপালা নিয়ে থাকে। দেখুন গিয়ে জড়িবুটি কিছু দেয় কি না। তবে মানুষটা একটু কানে-খাটো, সেই বুঝে গলা তুলে বলবেন।"

গাঁটু বলে উঠল, "ও এই তা হলে সেই কানে-খাটো গুপি। ও কাকু, কুমিরে-খাওয়া গুপির কাছে তো কই গেলে না? আর সেই জেলখাটা গুপির কাছে?"

"গাঁটু তুই থামবি? একেই তো মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নেহাত পিসি আশা করে বসে আছে, তাই…"

কানে-খাটো গুপি বাড়ির সামনে একখানা খুরপি নিয়ে গাছের গোড়া কোপাচ্ছিল, হাত ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কী

কইছেন ? টাকের ওষুধ ? টাকের আবার ওষুধ আছে নাকি দুনিয়ায় ? থাকলে—দুনিয়ার সেরা-সেরা বড় মানুষরা পাকা বেলের মতন মাথা নিয়ে ঘুরে বেড়াত না। ভরদুপুরে গাড়ি চেপে টাকের ওষুধ খুঁজতে ''

মদন আগ বাড়িয়ে বলল, টাকের ওষুধ নয় দাদু, বাতের ওষুধ গেঁটে বাতের না কী যেন।''

"কী বললে ? ভাতের ওষুধ ? ভাতের আবার ওষুধ কী হে ? তাও আবার পেটে ভাতের। বলি ভাত তো পেটেই জানান দেয়, মাথায় মাখে এমন তো শুনিনি। যত্তসব ফৈজত। যাও যাও, অসময়ে দিক কোরো না।''

আবার খুরপি নিয়ে বসে।

মদন গম্ভীরভাবে বলে, ''কী বাবু আরও গুপি খুঁজে বেড়াবেন ? তা নিয়ে আমি যেতে পারি, ওই ক'খান চালাবাড়ির পরেই 'ট্যারা গুপি' আর 'কানা গুপি' দুই ভাইয়ের ঘর—তা ছাড়া আপনার গে বউ-মরা গুপিও নিকটেই থাকে। বাকি গুপিদের হদিস আমার জানা নাই।''

প্রবুদ্ধ বলে, "আচ্ছা বাপু, বউ তো অনেকেরই মরে যায়। আত্মীয়স্বজন কেউ না-কেউ মরেই, তাতে বউ-মরা বলে নাম দেগে দেওয়া কেন ?"

মদন একটু মধুর হাসি হেসে বলে, "আজ্ঞে, লোকটা পর পর এগারোবার বে করেছিল, একটা বউও টেকেনি। তাই।"

"পর পর এগারোটা বিয়ে !"

"তা কী করবে বাবু। ঘরসংসার করতে, ভাত রেঁধে দিতে পরিবার তো একটা দরকার। তো শেষমেশ মনের ঘেন্নায় আর বে করেনি। নিজেই ভাত রেঁধে খায়। লোকে ওই নামটাই দিয়ে রেখেছে।''

ভাত খাওয়ার কাহিনী শুনেই বোধ হয় গাঁটুর পেট সচেতন হয়ে ওঠে, সে হঠাৎ জোর গলায় ঘোষণা করে, "কাকু, আমার ভাত-খিদে পেয়েছে।"

"কী বললি ? কী খিদে পেয়েছে ?"

"ভাত-খিদে। ভাত খাব।"

"ওঃ অসহ্য। এই তো সকালে পেটভরে কত কী খেলি। এক্ষুনি তোর ভাত-খিদে পেয়ে গেল?"

মদন আগ বাড়িয়ে বলে ওঠে, "তা পেতে পারে বইকী বাবু! কাঁচা ছেলে। বেলা দুপুর তো হয়েই গেছে। আমারই তো খিদের টাইম হয়ে গেছে। তো আমায় এবার ছেড়ে দ্যান।"

"কী মুশকিল, একটা ভাল দেখে হোটেল-ফোটেল অন্তত দেখিয়ে দাও! আছে কিছু?"

মদন অবজ্ঞার গলায় বলে, "কত চান? এ কি আপনি বাঁকড়ো-বীরভূম পেয়েছেন যে, পথে বেরোলে খাঁ-খাঁ মরুভূমি! আমাদের এখেনে এই বর্ধমানে মোড়ে—মোড়ে খাবারের দোকান, অলিতে-গলিতে ভাতের হোটেল।"

"না, না। গলির হোটেল নয়, রাস্তার ওপরে ভাল হোটেল?"

"ওই তো দু' পা গেলেই পেয়ে যাবেন, 'অন্নপূর্ণা হোটেল'। বাসমতী চালের ভাত, চার ইঞ্চি মাছের পিস! তিন-চাররকম ব্যঞ্জন! তবে তাতে রেট একটু বেশি।"

"কত! অ্যাঁ?"

"আজ্ঞে, মাথা পিছু পঁয়তিরিশ। ছেলেবুড়ো সমান দর। তবে ওটা হচ্ছে ইসপেশাল। অর্ডিনারিও আছে।"

হোটেল-মালিক বলেন, "কী দেব? অর্ডিনারি না স্পেশাল?"

"স্পেশালই দিন।"

হোটেল-মালিক ভজহরি পাল হাঁক ছাড়েন, "ওরে গুপে, দুটো স্পেশাল!"

প্রবুদ্ধ তাড়াতাড়ি বলে, "ইয়ে তিনটেই বলুন। এই রিকশওলা বেচারিরও খিদের সময় হয়ে গেছে বলছিল..."

"ওর জন্যও স্পেশাল?"

গাঁটু চটপট বলে ওঠে, "তো তিনজনের দু'জন ভাল খাবে, আর একজন খারাপ খাবে? ভদ্রতা বলে একটা কথা নেই?"

মালিক একটু হেসে বলে, "তা তো বটেই। ঠিক আছে, গুপি, তিনটে স্পেশাল।"

প্রবুদ্ধ বলে ওঠে, "এখানেও গুপি?"

কেন? গুপিতে আপনার আপত্তি আছে? গুপি অবশ্য

এদিকে একটু বেশি। তবে…”

“না, মশাই, আপত্তির কথা ওঠে না। গুপি খুঁজতেই আপনাদের এই আজব দেশে আসা। এসে অবধি জঙ্গলে দিশেহারা হয়ে বেড়াচ্ছি। অথচ আসল গুপিকে পাওয়া গেল না।”

ভজহরি অবাক হয়ে বলে, “কী ব্যাপার? বিত্তান্তটা কী?”

মদনের মুখ এখন স্পেশালের আশায় উদ্ভাসিত। সে তাড়াতাড়ি প্রায় এক নিশ্বাসে বৃত্তান্তটি বুঝিয়ে দেয়। আর দেওয়া মাত্রই ভজহরি কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, “হায় গোপীনাথ। এ-কথা আগে বলবেন তো? মানে এইখানেই আগে খোঁজ করবেন তো? ওই তো আমাদের ‘খ্যাপা’ গুপি’ রয়েছেন। কেবলমাত্তর গেঁটে বাতেরই প্রেসক্রিপশন বাতলান। অব্যর্থ।”

“অ্যাঁ! সত্যি! ঠিক বলেছেন?”

আহ্লাদে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে যায় প্রবুদ্ধ। “কই, কোথায়? এক্ষুনি নিয়ে চলুন আমায়।”

খ্যাপা গুপি শুনেই আরও আশা উথলে উঠেছে। এইসব খ্যাপা-ট্যাপারাই নাকি ভগবানতুল্য হন।

ভজহরি বলল “আহা সে লোক তো আর পালিয়ে যাচ্ছেন না। বেলা তিনটে থেকে সন্ধে ছ’টা পর্যন্ত উই স্টেশনের ধারে ‘নিউ ওরিয়েণ্ট’-এ বসেন। এখন তো আপনার মাত্তর পৌনে দুটো। ধীরেসুস্থে খাওয়া-দাওয়া সারুন, এর পর এই রিকশওলাই নিয়ে যাবে। ওহে, নিউ ওরিয়েণ্ট চেনো তো?”

“মনে হচ্ছে ইস্টিশানের রাস্তায় কোথায় যেন একটা ওইরকম সাইনবোর্ড দেখেছি। তবে খ্যাপা-ট্যাপারে দেখি নাই।”

“আহা, উনি কি আর সর্বদা থাকেন? শুধু এই তিনটে থেকে ছ’টা।…কই রে গুপে, চটপট দে?”

হোটেলের বয় চটপট দেবে এমন আশা করা যায় না, প্রবুদ্ধ ঘনঘন ঘড়ি দেখে এবং তাগাদা লাগায়।

অতঃপর আসে সেই স্পেশাল।

প্রবুদ্ধ মনে মনে ভাবে, চালটা বাসমতী না বাঁশমতী? আর ইঞ্চির মাপটাও কি এদের স্পেশাল? কিন্তু কথাটি বলে না।

কতবড় একটা উপকার করল অন্নপূর্ণা হোটেলের মালিক। সে কৃতজ্ঞতা নেই? আহা! গাঁটুটার যদি সক্কালবেলাই ভাত-খিদে পেত রে।

তা প্রবুদ্ধর চাঞ্চল্য আছে বলে তো আর মদনচন্দ্রের ধীরেসুস্থে খাওয়ার ব্যাঘাত ঘটে না। পৌনে তিনটে নাগাদ উঠে পড়ে হোটেলের বিল মেটায় প্রবুদ্ধ। মদন বলে, "এই সঙ্গে আমার হিসাবটা মিটিয়ে দ্যান বাবু। আপনার গিয়ে এগারোটা দশে উঠছেন আর আপনার গে সেই সেথায় পেঁাছতে তিনটে দশই হয়ে যাবে।"

তার মানে চার ঘণ্টার মিটার।

প্রবুদ্ধ তো হাঁ। তুই ব্যাটা যে পাক্কা এক ঘণ্টা ধরে মৌজ করে খেলি, সেটাও মিটারে উঠবে? কিন্তু বলে উঠতে তো পারে না। ভদ্রতা বলে একটা কথা আছে না? যাক গে—সব ভাল যার শেষ ভাল। শেষ অবধি যে পিসিমা তিনদিনের মধ্যে 'হাইজাম্প' দেওয়ার ক্ষমতা ফিরে পাবেন, এতেই প্রবুদ্ধ বিগলিত।

"এই যে বাবু নিউ ওরিয়েণ্ট।"

মদন বলে, এখান থেকে ইস্টিশান হাঁটাপথ। আমায় এবার ছেড়ে দ্যান হেভি খাওয়া হয়ে গেছে, আর পা চলছে না।"

এ কী, এটা তো একটা সাইকেলের দোকান।

সঙ্গে-সঙ্গে ভুল ভাঙে। হলেও সাইকেলের দোকান, তার মধ্যেই একটি জলচৌকির ওপর বিরাজ করছেন তিনি। পরনে একটা বড় লাল রঙের আলখাল্লা গোছের, হাতে দু' গাছা মোটা-মোটা তামার বালা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। আহা! এর কাছে অবধারিত অব্যর্থ ওষুধ মিলবে।

তা মিলল।

গিয়ে বসা মাত্রই বললেন, "গেঁটে বাত তো?"

প্রবুদ্ধ এই অলৌকিক শক্তি দর্শনে অবাক হয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকল। না বলতেই! কী আশ্চর্য!

খ্যাপা গুপি সামনে রাখা একটি ছোট্ট কাঠের হাত বাক্স থেকে একখানি মুখবন্ধ ব্রাউনরঙা খাম বার করে বললেন, "এই

নিয়ে যাও। নিয়মাবলী ভিতরে লেখা আছে। তিন দিনে ফলপ্রদ। তবে খাম এখন খুলো না, একেবারে বাড়ি নিয়ে গিয়ে রুগির হাতে দেবে।"

প্রবুদ্ধ বিহ্বল।

"কত লাগবে?"

"কত? কিছু না। শুধু মায়ের ভোগের জন্য ওই কাটা বাক্সটায় গোটা কুড়ি-পঁচিশ যা পারো দিয়ে যাও অবশ্য পঞ্চাশ-একশোও দেওয়া যায়। যার যা ইচ্ছে। লাগবে তো মায়ের ভোগে। জয় মা কালী!"

ট্রেনের টিকিট কাটবার কালে গাঁটু বলে, "কাকু, পিসঠাকুমা বলে দিছল বর্ধমানের ইস্টিশানে খুব ভাল সীতাভোগ মিহিদানা পাওয়া যায়।"

প্রবুদ্ধ করুণ গলায় বলে, "আমি তোকে কলকাতা থেকেই বর্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানা খাওয়াব। এখন পকেট একদম সাফ। আহা, তোর যদি বর্ধমান স্টেশনে নেমেই ভাতের খিদেটা পেয়ে যেত রে!"

পিসিমা আহ্লাদে বিগলিত আর ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে এসে খামটি কপালে ছুঁইয়ে তার মুখটি খোলেন, এবং তারপরই সেটি ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে রাগা গলায় বলে ওঠেন, সারাদিন হুল্লোড় করে এসে কাকা-ভাইপো বুঝি আমার সঙ্গে মশকরা করতে এলি?"

গজেন্দ্র চাকলাদার বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের ওখানে গুপি নামটার চলন একটু বেশি। তো সেটায় আশ্চর্যের কিছু নেই। আমার এক দাদার শ্বশুরবাড়ির দেশে ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পিছনে উঠতে-বসতে 'কেষ্ট'। শুধু গ্রামেই বা কেন, এই কলকাতাতেই দেখো গে নর্থের দিকে, একটা গলির সামনে 'বাবলু' বলে ডাক পাড়লে সাতটা বাবলু বেরিয়ে আসবে। তা শেষ পর্যন্ত বাঁশবনে ডোমকানা হয়ে ফিরে এলে? আসলের সন্ধান পেলে না?"

প্রবুদ্ধ তাড়াতাড়ি বলে, "না না। সন্ধান পেয়েছি তো।"

"অ্যাঁ! পেয়েছ? এতক্ষণ বলছ না সেটা? শুধু গুপি-বৃত্তান্ত শোনাচ্ছ? তো পেয়েছ ওষুধ?"

প্রবন্ধ ঈষৎ মলিন, "ওষুধ কিছু নয়। শুধু প্রেসক্রিপশন। এই যে।"

পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বার করে বাড়িয়ে ধরে। …ছোঁ মেরে টেনে নেন চাকলাদার।

আর নিয়েই এক নজর ফেলে বলেন, "ইস, সেদিন এই আসল নামটিই মনে পড়েনি সরি। ভেরি সরি। খ্যাপা গুপি। তো, ওষুধ নয় বলছ কেন? এইটাই তো ওষুধ। পড়ে দ্যাখোনি ভাল করে? এই দ্যাখো।"

কাগজখানা আবার বাড়িয়ে ধরেন।

মাথার ওপরে লেখা 'ওঁ'; তার নীচে লেখা:

> 'নিশ্চিত নিরাময়! সর্বপ্রকার গেঁটে বাতের মহৌষধ। তিনদিনে ফলপ্রসূ।…অবিলম্বে একখানি 'নিউ ওরিয়েণ্ট সাইকেল' সংগ্রহ করে প্রতিদিন দুইবেলা দুই ঘণ্টা করে চালান। নিয়মপালনে ব্যতিক্রম ঘটিলে নিরাময়ের আশা নাই। নিষ্ঠার সহিত নিয়ম পালন করুন অব্যর্থ বিশল্যকরণী!
>
> শ্রীশ্রীকালীমাতা চরণাশ্রিত
> দীনভক্ত খ্যাপা গুপি।'

চাকলাদার উদ্দীপ্ত, "এটাই ওষুধ। তো কিনে এনেছেন একখানা ওই নিউ ওরিয়েণ্ট?"

বড়বাবু বলে কথা! প্রবন্ধ ভয়ে-ভয়ে বলে, "না, মানে পিসিমার পক্ষে দৈনিক চার ঘণ্টা করে সাইকেল চালানো—বাহাত্তর বছর বয়েস….

"ওঃ, তার মানে সম্ভব নয়। কেমন?" চাকলাদার অগ্নিমূর্তি। "বাহাত্তর তো কী? ওটা কোনও ফ্যাক্টরই নয়। গেঁটে বাত কিছু আর দুধের বাচ্চাদের হয় না, বয়েসেই হয়। আসলে হচ্ছে আলস্য! অবিশ্বাস! নিষ্ঠার অভাব। এইটিই হচ্ছে আমাদের বাঙালির দোষ। গাছের গোড়ায় জলটি দেব না, অথচ পাকা ফলটি খেতে চাইব। বদ্যির নির্দেশটি মানব না, অথচ ব্যাধিটি সারবার আশা করব…. একটা গ্যারাণ্টি দেওয়া 'শিওর কিওর' ব্যাপার, অথচ সামান্য চেষ্টা আর উদ্যমের অভাবে…হ্যাত। এইজন্যই বাঙালির কিসসু হয় না।"